যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার

যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার

শ্রীবিধুভূষণ পাল

খাদ্যতত্ত্ব, পথ্যবিধি, যক্ষ্মাপ্রশমন, মেডিক্যাল কেস্-টেকিং (Medical Case-Taking) শিশুখাদ্য, জলের প্রকৃতি ও প্রয়োগ প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা, ঢাকা গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল স্কুলের মেডি-সিনের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

কলিকাতা

১৩৪৬

প্রকাশক
শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ পাল
৩৯।৫।১এ গোপালনগর রোড
পোঃ আলিপুর
কলিকাতা

মূল্য এক টাকা মাত্র

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

যক্ষ্মা একটি দারুণ রোগ। এ রোগে বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে, এবং তদপেক্ষা আরও অধিক সংখ্যক লোক ইহাতে নানারূপে কষ্ট পায় ও অর্থোপার্জনে অক্ষম হয়। আজকাল আমাদের দেশে যক্ষ্মার প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার প্রতিকার কল্পে চেষ্টার প্রারম্ভেই যক্ষ্মা ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়গুলি জনসাধারণ ও রোগী এ উভয় পক্ষেরই বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। উভয় পক্ষের জ্ঞানপ্রসূত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহকারিতা ব্যতীত এ চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। জনসাধারণের মধ্যে এ সমস্ত জ্ঞানের অভাবে চিকিৎসা পরিচালনারও অন্তরায় ঘটে; অতি সামান্য বিষয়ের জন্যও অযথা চিকিৎসকের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

জ্ঞান বল একটি প্রধান বল। দেশের কল্যাণকামনায় জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের বহুলপ্রচার অত্যন্ত আবশ্যক। এই জ্ঞানের বিপুল বিস্তার দ্বারা জনসাধারণের মনে পৌরস্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধনের প্রবল আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। জনসাধারণের মনে বাস্তবিক এজন্য দৃঢ় সঙ্কল্প জাগরিত হইলে শত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অভীষ্ট সাধনের উপায় উদ্ভাবনের অভাব হইবে না। তখন সকলের সমবেত চেষ্টায় যক্ষ্মাপ্রশমনের এবং তথা পৌরস্বাস্থ্যের নানাপ্রকারে উন্নতি সাধনের পথ সুগম হইবে। অন্যান্য সভ্য দেশের লোক এরূপ ভাবে চেষ্টা করিয়া বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছে। আমাদের চেষ্টায়ও

সেইরূপ ফল লাভ না হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এই উদ্দেশ্যে [illegible]রোগ সম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ এখানে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইলাম।

এই পুস্তকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির অনুমোদিত কয়েকটি নূতন শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে।

৩৯।৫।১এ গোপালনগর রোড
পোঃ আলিপুর
কলিকাতা
১লা বৈশাখ, ১৩৪৬ সন।

শ্রীবিধুভূষণ পাল

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম খণ্ড

যক্ষ্মা ও যক্ষ্মাবীজাণু সম্বন্ধীয় স্থূল কথা

যক্ষ্মা একটী বীজাণুজ সংক্রামী রোগ। যক্ষ্মাবীজাণুই এই রোগের মুখ্য কারণ। সাধারণতঃ ইহা একটী দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ। কিন্তু সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ শিশুদের মধ্যে উহা উগ্র ধরণের হয় এবং অল্প কাল মধ্যে মারাত্মক হইতে পারে। ইহা একটী নিবার্য রোগ। পূর্বে লোকের ধারণা ছিল যে, এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাতে আরোগ্যলাভ সাধ্যায়াত্ত হইয়াছে। এ রোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তিনটী বিষয় আবশ্যক :—

১। প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার আরম্ভ।

২। দীর্ঘকালব্যাপী চিকিৎসা।

৩। আরোগ্যলাভের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প।

রোগজনক বীজাণু মধ্যে যক্ষ্মাবীজাণু একটী প্রধান। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত কক্ (Koch) সাহেব ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইহা আবিষ্কার করেন। ইহা অতি নিম্নস্তরের উদ্ভিদশ্রেণীভুক্ত এক প্রকার গতিহীন পরজীবী বীজাণু। ইহা অতিশয় ক্ষুদ্র, প্রায় $\frac{১}{৫০০}$ মিলিমিটার লম্বা। বিশেষ শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-যন্ত্র ব্যতীত উহা দেখা যায় না। রোগীর শ্লেষ্মা বিশেষ প্রকারে রঞ্জিত করিয়া অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে উহা দেখিতে হয়। দেখিতে উহা কিঞ্চিৎ বক্র দণ্ডাকৃতিবিশিষ্ট। ইংরাজীতে উহাকে টিউবারকল্ ব্যাসিলাস্ (Tubercle Bacillus) বলে।

সকল অঙ্গেরই যক্ষ্মা হইতে পারে, কিন্তু ফুসফুসেই যক্ষ্মা সর্বাপেক্ষা অধিক হয়।

এ বীজাণু সংক্রমণে দেহের লসীকাগ্রন্থি (Lymphatic glands), অস্থি, সন্ধিস্থল, অন্ত্র, বৃক্ক (kidney), মস্তিষ্কের ঝিল্লী, বাগ্‌যন্ত্র, ফুসফুস ইত্যাদি সকল অঙ্গেরই রোগ জন্মিতে পারে ; কিন্তু তন্মধ্যে শতকরা প্রায় পঁচানব্বই ভাগ স্থলেই ফুসফুস এই বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে।

ফুসফুসে যক্ষ্মাধিক্যের কারণ

ফুসফুসের কলা (tissue) এই বীজাণুসমূহের পুষ্টির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। উহার লসীকা-প্রণালী ও রক্তসঞ্চালন-প্রণালীর কিছু ত্রুটি আছে, এজন্য ফুসফুস যক্ষ্মাবীজাণুর বৃদ্ধি-নিরোধ করিতে অপেক্ষাকৃত অসমর্থ। এই বীজাণুসমূহ দেহে প্রবেশের পর লসীকা-প্রণালীর মধ্য দিয়া রক্তে নীত হয়, তথা হইতে তাহারা প্রথমেই ফুসফুসের জালকে (capillaries) প্রবেশ করে এবং সেখানেই সর্বপ্রথমে তাহাদের গতি রুদ্ধ হয়। এই সব কারণে ফুসফুস যক্ষ্মাবীজাণু দ্বারা এত অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

যক্ষ্মাবীজাণুর শ্রেণী বিভাগ

যক্ষ্মাবীজাণু প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। মানবীয় যক্ষ্মাবীজাণু

২। গব্য যক্ষ্মাবীজাণু

৩। বিহঙ্গীয় যক্ষ্মাবীজাণু

মানবীয় যক্ষ্মাবীজাণু্ মনুষ্য, গিনিপিগ (guineapig) ও বানর ব্যতীত অন্য প্রাণীর পক্ষে রোগজনক নহে। গব্য যক্ষ্মাবীজাণু্ মনুষ্য ও গোজাতি এ উভয়ের পক্ষেই রোগজনক। বিহঙ্গীয় যক্ষ্মাবীজাণু্ কেবল মুরগী কবুতর ইত্যাদি পক্ষিজাতীয় প্রাণীর পক্ষে রোগজনক। ইহা মানব দেহে কোন রোগ উৎপাদন করে না।

প্রাপ্তবয়স্কদের যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ (Pulmonary Tuberculosis or Phthisis) প্রায় সম্পূর্ণরূপে কেবল মানবীয় যক্ষ্মাবীজাণু্ হইতেই স্বষ্ট হইয়া থাকে। শিশুদের যক্ষ্মা পূর্ণবয়স্কদের যক্ষ্মার মত এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না; তাহাদের এ রোগ সাধারণতঃ উগ্র (acute) হইয়া থাকে। তাহাদের ফুসফুসের যক্ষ্মারোগও মানবীয় যক্ষ্মাবীজাণু্ দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে।

গব্য যক্ষ্মাবীজাণু্ হইতে সাধারণতঃ শিশুদের ও বয়ঃপ্রাপ্তদের গণ্ডদেশ ও উদর গহ্বরস্থ লসীকাগ্রন্থি, অন্ত্র, অস্থি, সন্ধিস্থল প্রভৃতি অঙ্গে রোগের উদ্ভব হইয়া থাকে। অতি কদাচিৎ গব্য যক্ষ্মাবীজাণু্ হইতেও ফুসফুসের যক্ষ্মা (Pulmonary Tuberculosis) হইতে পারে।

টিউবার্কিউলোসিস, যক্ষ্মা, যক্ষ্মাবীজাণুজ রোগ, ক্ষয়রোগ শব্দের অর্থ

ফুসফুসের এই বীজাণুজ রোগই সাধারণতঃ যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ (Phthisis, Consumption বা Pulmonary Tuberculosis) নামে অভিহিত হয়। ফুসফুসের এই বীজাণুজ রোগে দেহ অতিশয় কৃশ হয়, এজন্যই এ রোগকে ইংরাজীতে থাইসিস্ (Phthisis) বা কন্‌জাম্প্‌শন (Consumption) এবং বাংলাতে ক্ষয়রোগ বলে। ইংরাজীতে এই বীজাণুজ রোগসমূহের সাধারণ নাম টিউবার্কিউলোসিস

(Tuberculosis), এখন ইহা ফুসফুসেরই হউক বা অন্য অঙ্গেরই হউক। ইংরাজী টিউবার্কিউলোসিস শব্দের অর্থে "যক্ষ্মাবীজাণুজ রোগ" শব্দ ব্যবহার করা সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু যক্ষ্মা শব্দটি এই অর্থে বহুলপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং 'যক্ষ্মা' শব্দটি এখন দুই প্রকার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটী ইংরাজী টিউবার্কিউলোসিস শব্দের ন্যায় ব্যাপক অর্থে সর্বপ্রকারের যক্ষ্মাবীজাণুজ রোগ বুঝাইতে, আর একটি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে অর্থাৎ কেবল ফুসফুসীয় যক্ষ্মা বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

এ রোগের মূল কারণ এই বীজাণু হইলেও উহা কেবল দেহে বিদ্যমান থাকিলেই সব সময় এ রোগ হয় না; কিন্তু উহার অভাবে কখনও এ রোগ হইতে পারে না।

যক্ষ্মারোগের ব্যাপকতা

যক্ষ্মা সার্বকালিক, সার্বদেশিক ও সার্বজনীন রোগ। ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই এবং সকল সভ্য দেশেই বিদ্যমান আছে। ইহা শিশু-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, স্থূলকায়-কৃশকায়, সবল-দুর্বল সকলেরই হইতে পারে। ইহা সকল স্থানে থাকিলেও পল্লী অঞ্চল হইতে নগর মধ্যেই ইহার বিশেষ আধিক্য দৃষ্ট হয়, এবং ধনবান হইতে নির্ধনেরই ইহা বেশি হয়। যাহারা যত্নপূর্বক স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করে, তাহাদের মধ্যে ইহা কম হয়।

যক্ষ্মাবীজাণুর প্রধান আধার ও বিস্তৃতি

যক্ষ্মারোগগ্রস্ত মানুষ ও গরুই এই বীজাণুর প্রধান আধার। রুগ্ন ব্যক্তির ও গাভীর দেহজাত এই বীজাণুবাহী সকল নিঃসৃত পদার্থই

বিপজ্জনক। রোগীর শ্লেষ্মা, মল, মূত্র, পূয প্রভৃতি দেহনিঃসৃত যে কোন পদার্থের সহিত এই বীজাণু নির্গত হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ রোগীর শ্লেষ্মার সহিতই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বীজাণু নিঃসৃত হইয়া থাকে। রোগের কঠোর অবস্থায় একজন ক্ষয়রোগীর শ্লেষ্মার সহিত প্রতিদিন এত অসংখ্য বীজাণু নির্গত হয় যে, তাহাদের সমষ্টি সমগ্র পৃথিবীর লোক-সংখ্যার সমান হইবে। তাহা ছাড়া এমনও কতক লোক আছে যে, তাহারা ক্ষয়রোগে ভুগিতেছে এমন কোন লক্ষণের বিকাশ দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাহাদের শ্লেষ্মার সহিতও যক্ষ্মাবীজাণু নিঃসৃত হইয়া অন্য লোককে সংক্রামিত করিতে পারে।

একথা বলা বাহুল্য যে, যক্ষ্মারোগীর শ্লেষ্মার সহিত মানবীয় যক্ষ্মাবীজাণুই নিঃসৃত হয়। দুগ্ধবতী গাভীর যক্ষ্মা-গ্রহণশীলতা (susceptibility) খুব বেশি। রোগের উৎকট অবস্থার যক্ষ্মাগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধে যথেষ্ট বীজাণু (গো-যক্ষ্মাবীজাণু) থাকে। এরূপ গাভীর দুগ্ধ হইতে এবং রুগ্ন গোমাংস হইতে গো-যক্ষ্মাবীজাণু বিস্তার লাভ করিয়া থাকে।

যক্ষ্মা সভ্য জগতের রোগ। সকল সভ্য দেশেই যক্ষ্মারোগগ্রস্ত মানুষ ও গরু আছে। এজন্য যক্ষ্মাবীজাণু প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

এরূপ সর্বগত বীজাণুর সংক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করা কার্যতঃ প্রায় অসম্ভব। এজন্য প্রায় সকলেই যৌবনকাল আরম্ভ হইবার পূর্বেই এ বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত হইয়া থাকে। বহুশতক যাবৎ এ বীজাণু-সংস্পর্শে থাকিয়া আমাদের এ বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে জাতিগত অনাক্রম্যতা (immunity) অধিগত হইয়াছে।

সংক্রমণের বিবিধ উপায়

প্রধানতঃ কি উপায়ে এই বীজাণু আমাদের দেহে প্রবেশ লাভ করে, সে বিষয়ে সর্ববাদীসম্মত মীমাংসা এখনও হয় নাই। কিন্তু সাধারণতঃ যে নিম্নোক্ত উপায়ে এই বীজাণুসমূহ আমাদের শরীরে প্রবেশলাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

শ্বাসের সহিত—যক্ষ্মারোগীর শ্লেষ্মার সহিত অগণিত বীজাণু নির্গত হইয়া থাকে। সেই শ্লেষ্মা ভূমিতে পড়িলে শুষ্ক হইয়া যায় এবং পরে চূর্ণীকৃত অবস্থায় বায়ুস্থ ধূলিকণার সহিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। বীজাণুসমূহ এই ধূলিকণাতে জীবন্ত থাকে এবং শ্বাসবায়ুর সঙ্গে আমাদের ফুসফুসে নীত হইয়া এ রোগ সৃষ্টির কারণ হইতে পারে।

মুখের আর্দ্রকণাসহযোগে—রোগী যখন জোরে কথা বলিতে, হাঁচিতে বা কাসিতে থাকে, তখন তাহার মুখ বা নাসিকা হইতে এই বীজাণুবাহী অসংখ্য আর্দ্রকণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। সাধারণতঃ এই আর্দ্রকণাসমূহ প্রায় ২।৩ ফুট দূরে নীত হয়, কিন্তু সময়ে সময়ে আরও অধিক দূরেও যাইতে পারে। এই আর্দ্রকণাসমূহ শ্বাস-বায়ুর সহিত নিকটস্থ লোকের অভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিয়া পরে এ রোগ উৎপত্তি করিতে পারে।

খাদ্যসহযোগে—দূষিত খাদ্য ও পানীয়াদির সহিতও এই বীজাণুসমূহ আমাদের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই রোগগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধও বীজাণু দ্বারা দূষিত হইয়া থাকে। সেই দূষিত দুগ্ধ জ্বাল দিয়া উত্তমরূপে না ফুটাইয়া পান করিলে আমাদের দেহেও উক্ত বীজাণুসমূহ দুগ্ধসহযোগে সঞ্চারিত

হইয়া থাকে। রোগবীজাণু-দূষিত অঙ্গুলি, খেলনা, পেন্‌সিল, থালা, বাটি, গ্লাস, চামচ, গামছা, রুমাল ইত্যাদির সহিত এবং মুখচুম্বনে বীজাণুসমূহ মুখপথে আমাদের অভ্যন্তরে নীত হইতে পারে।

ছিন্ন ত্বকের মাধ্যমে—ছিন্ন ত্বকের ভিতর দিয়াও অবস্থাবিশেষে এই বীজাণু আমাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। এরূপভাবে সাধারণতঃ শবচ্ছেদকারী ডাক্তার, ডোম এবং মাংস-বিক্রেতা কসাইগণের দেহে এ বীজাণু প্রবেশ করিবার স্থবিধা ঘটে।

শ্বাস-পথের ভিতর দিয়াই হউক বা পৌষ্টিকনালীর (Alimentary canal) ভিতর দিয়াই হউক, যে কোন পথেই যক্ষ্মাবীজাণু আমাদের দেহে প্রবেশলাভ করুক না কেন, ইহাতে সাধারণতঃ সাক্ষাৎভাবে সংক্রমণ ঘটে না। বীজাণুসমূহ মুখবিবর, কণ্ঠাশয় (Pharynx) বা পৌষ্টিকনালীর অক্ষত শ্লেষ্মাঝিল্লী ভেদ করিয়া লসীকা-প্রণালী ও রক্তে উপনীত হয়, সেখান হইতে ফুসফুসের জালকে (Capillaries) প্রবেশ-লাভ করে। তাহার পর রক্তের শ্বেতকণিকাসহযোগে সঞ্চালিত হইয়া ক্ষুদ্র ব্রঙ্কাইয়ের গাত্রস্থ লসীকাতে (Peribronchial Lymphatics) উপস্থিত হয় এবং সেই স্থানে তাহাদের গতিরোধ হইয়া গুটিকার (Tubercles) উদ্ভব হইয়া থাকে, অথবা তথা হইতে নিকটস্থ লসীকা-গ্রন্থিতে প্রবেশ করিয়া তাহারা বহুকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিতে পারে।

যক্ষ্মাবীজাণু-সংক্রমণ ও রোগের প্রভেদ

বীজাণুসমূহ আমাদের অজ্ঞাতসারেই দেহে প্রবেশলাভ করে এবং তথায় বহুদিন, এমন কি চিরজীবন যাপ্য অবস্থায় থাকিতে পারে। এরূপ যাপ্যভাবে বীজাণুর দেহে অবস্থিতিকেই বীজাণু-সংক্রমণ বলে। যক্ষ্মাবীজাণু প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান আছে; এজন্য বীজাণু-সংক্রমণ খুব

বেশি, শহরে প্রায় কেহই ইহার হাত এড়াইতে পারে না। অনুসন্ধান করিলে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ জনের মধ্যে যক্ষ্মাবীজাণুর অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার তুলনায় যক্ষ্মারোগ অতি কম। বীজাণু-সংক্রমণ ও যক্ষ্মারোগ এক হইলে আমাদের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইত। বীজাণু-সংক্রমণ ব্যতীত যক্ষ্মারোগ হইতে পারে না, কিন্তু সংক্রমণ হইলেও অনেক সময় যক্ষ্মারোগ না হইতে পারে। জীবনের যে কোন সময়ে অনুকূল অবস্থায় যক্ষ্মাবীজাণু দেহে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ প্রথম বীজাণু-সংক্রমণ বাল্যকালেই ঘটিয়া থাকে। এই বীজাণুসমূহ দেহে বহুকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিতে পারে। পরে কোন কারণে সংক্রামিত ব্যক্তির প্রতিরোধক শক্তি হ্রাস পাইলে তাহারা সক্রিয় হইয়া বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ব আবাস ছিন্ন করিয়া লসীকা-প্রণালী বা রক্ত সহযোগে দেহের অন্য স্থানে বিস্তারলাভ করিয়া প্রকটিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং রোগের লক্ষণ বিকাশ করে।

যক্ষ্মাবীজাণুর অবস্থিতির ফলে দেহকলার (Tissue) পরিবর্ত্তন

দেহে প্রবেশলাভের পর যক্ষ্মাবীজাণুসমূহ কোন যন্ত্রের (Organ) কলাতে (Tissue) অবস্থিতি করিতে পারিলে, সেই স্থানে বীজাণুসমূহকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র সৃষ্ট হয়। বীজাণুসমূহ তথায় আবাস স্থাপন করিয়া নিজের পুষ্টি ও বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা সৃজন করিতে সচেষ্ট হয় এবং দেহস্থ জীবকোষের বিনাশকারী বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন করে। অপর দিকে দেহের জীবকোষসমূহও বীজাণু-ধ্বংসকারী পদার্থ উৎপন্ন করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে প্রয়াস পায়। দেহে বীজাণু-সংক্রমণ ও তাহার প্রতিরোধ করিবার শক্তির

বিকাশ বাস্তবিক একসঙ্গেই চলিতে থাকে। বীজাণু-সংক্রমণ ব্যতীত দেহে উহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য শক্তিরও উদ্ভব হয় না। এরূপে উভয়ের মধ্যে এক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যদি দেহের জীবকোষসমূহ জয়লাভ করে, তবে বীজাণুসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে ; আর যদি বীজাণুসমূহ জয়ী হয়, তবে তাহারা দেহে আবাস স্থাপন করিয়া বৃদ্ধিলাভ করে।

এই সব প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে কতকগুলি স্ফীত জীবকোষ একত্র সঞ্চিত হইয়া অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার (Tubercles) আকার ধারণ করে। স্ফীত জীবকোষসমূহের কতকগুলি বৃহৎ আকার ধারণ করে, উহাদিগকে অতিকায় জীবকোষ (Giant cells) বলে। সাধারণতঃ বীজাণুসমূহ উহাদের অভ্যন্তরে থাকে। অতিকায় জীবকোষসমূহ গুটিকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, উহাদের চারিদিকে অন্য রকমের জীবকোষ থাকে ; এই সমুদয়কে বেষ্টন করিয়া সামান্য সূত্রাকার তন্তু থাকে।

গুটিকাগুলিতে রক্ত সঞ্চালিত হয় না। রক্তের অভাবে এবং বীজাণু-নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থের প্রভাবে উহাদের অভ্যন্তরস্থ জীবকোষগুলি অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশ ক্রমে বিগলিত হইয়া বাহিরে নিঃসৃত হয় এবং তাহাতে বীজাণুসমূহ অন্যত্র বিস্তার লাভ করে। দেহের প্রতিরোধক শক্তির প্রাধান্য থাকিলে গুটিকার চারিদিকের সূত্রাকার তন্তুর বৃদ্ধি হইয়া এবং উহাতে ক্রমে ক্যাল্‌সিয়াম জমিয়া গুটিকাগুলি শুকাইয়া যাইতে পারে।

এক একটি গুটি অতিশয় সূক্ষ্ম, প্রায় পিনের অগ্রভাগের মত। অনেকগুলি গুটি একত্র মিলিত হইয়া পরে বৃহৎ আকার ধারণ করে। এই সব গুটির বৃদ্ধি হইতে অনেক সময় লাগে। কোন কোন ক্ষেত্রে বহু মাস এমন কি বৎসরাধিকও কাটিয়া যাইতে পারে। একটী বড়

গুটির অভ্যন্তরস্থ জীবকোষসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় বিগলিত হইয়া বাহিরে নিঃসৃত হইলে গর্তের (cavity) সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই বিগলিত পদার্থ ফুসফুসের ক্ষুদ্র শ্বাসনলীর গাত্র ছিন্ন করিয়া উহাতে পতিত হয়, পরে শ্লেষ্মার সহিত বাহির হইয়া যায়। এই বিগলিত পদার্থে অসংখ্য বীজাণু থাকে। প্রথমে বীজাণুসমূহ গুটিকার অভ্যন্তরে আবদ্ধ অবস্থায় ছিল, উহাতে অন্য লোকের সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। গুটিকা-নিঃসৃত বিগলিত পদার্থ শ্বাসনলীতে নিপতিত হইলেই বীজাণুসমূহ বিমুক্ত হইয়া রোগ বিস্তারের কারণ হয়। এই বিমুক্ত বীজাণুসমূহ ফুসফুসের অন্য অংশে নীত হইয়া তথায় রোগ বিস্তার করিতে পারে, এবং শ্লেষ্মার সহিত বাহিরে নির্গত হইয়া অন্য লোকের দেহে সংক্রামিত হইতে পারে।

দেহে বীজাণুসমূহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইয়া প্রসার লাভ অথবা বীজাণুসমূহের ধ্বংসপ্রাপ্তি, এই দুই প্রকার অবস্থা ব্যতীত আর এক প্রকার অবস্থা ঘটিতে পারে। তাহাতে বীজাণুসমূহের ধ্বংস বা বৃদ্ধি হয় না। বীজাণুসমূহ জীবন্ত কিন্তু নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বহুকাল দেহে থাকিতে পারে এবং কোন সময়ে অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হইলে উহারা তখন সক্রিয় ও প্রকটিত হইয়া থাকে।

অনাক্রম্যতা (Immunity)
আত্যন্তিক চেতনা (Hypersensitiveness)
পরিবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Allergy)

শিশুকালে যক্ষ্মাবীজাণু-সংক্রমণ হেতু আমাদের এ বীজাণু সম্বন্ধীয় কতকটা অনাক্রম্যতা জন্মে, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

রোগজনক বীজাণুর অনিষ্টজনক প্রভাব প্রতিরোধ করিবার শক্তিকে অনাক্রম্যতা বলে। এই বীজাণু-সংক্রমণের ফলে দেহে আর একটী বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হয়, ইংরাজীতে তাহাকে এলার্জি (Allergy) বলে। ইহাতে যক্ষ্মাবীজাণু বা তজ্জাত কোন পদার্থ সূচি-প্রয়োগে দেহে প্রবিষ্ট করাইলে অতি বেশি উগ্র প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। টিউবার্-কিউলিন একটি যক্ষ্মাবীজাণুজ পদার্থ। যাহার কোন দিন এই যক্ষ্মাবীজাণু-সংক্রমণ ঘটে নাই, এরূপ লোকের দেহে টিউবার্কিউলিন সূচিদ্বারা প্রবিষ্ট করাইলে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা যায় না। কিন্তু যাহার কোন দিন এই বীজাণু-সংক্রমণ ঘটিয়াছে, এরূপ লোকের দেহে উহা প্রবিষ্ট করাইলে তাহার দেহে অনতিবিলম্বে প্রবল প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ বিকাশ পায়। যে স্থানে উহা প্রয়োগ করা হইয়াছে সে স্থল লাল হয় ও ফুলিয়া উঠে, দেহের বীজাণু-সংক্রামিত স্থানে প্রদাহ হয় এবং জ্বর হয়। ইহার প্রভাবে সংক্রামিত ব্যক্তি যক্ষ্মাবীজাণুজ পদার্থ বিষয়ে অতি বেশি সচেতন (Hypersensitive) হয়। বীজাণু-সংক্রমণের ফলে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটিযা এরূপ আত্যন্তিক চেতনার উদ্ভব হইয়া থাকে। এই আত্যন্তিক চেতনাকেই এলার্জি (Allergy) বলে।

দেহে এই বীজাণুর সংক্রমণ হেতু যে অনাক্রম্যতা ও আত্যন্তিক চেতনা জন্মে, তাহাতেই দেহের রক্ষণকারী শক্তির বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে সংক্রামিত ব্যক্তির দেহে বাহির হইতে এই বীজাণু আর প্রবেশ-লাভ করিতে পারে না। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে ইতিপূর্বে বাল্যকালে যে সকল বীজাণু প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহারা বর্তমানে নিষ্ক্রিয় থাকিলেও ভবিষ্যতে অনুকূল অবস্থার আবির্ভাবে যে কোন সময় সক্রিয় হইয়া রোগ উৎপাদন করিতে পারে। শিশুকালের বীজাণু-সংক্রমণই শিশুদের

এবং প্রাপ্তবয়স্কদের যক্ষ্মারোগের মূল কারণ। বীজাণু-সংক্রমণের ফলে যে অনাক্রম্যতা ও আত্যন্তিক চেতনা জন্মে, তাহা স্থায়ী নহে। সাধারণতঃ অনাহার, অনিদ্রা, অতিশ্রম, দুশ্চিন্তা, বা অন্য রোগ ইত্যাদি কারণে এই রোগ-প্রতিরোধক শক্তি হ্রাস পাইতে পারে, অথবা একেবারে তিরোহিতও হইতে পারে।

পরীক্ষামূলক ভাবে টিউবার্কিউলিনের ব্যবহার

কোন ব্যক্তির বা গাভীর যক্ষ্মাবীজাণু-সংক্রমণ ঘটিয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সূচি-প্রয়োগে টিউবার্কিউলিন ব্যবহার করা হয়। ইহা প্রয়োগে দেহে কোন প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে উক্ত দেহে বীজাণু-সংক্রমণ ঘটিয়াছে বুঝা যাইবে। শিশুদের রোগ-নির্ণয়েও এ পরীক্ষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যক্ষ্মার বিবিধ প্রকারের বিকাশ

১। কখন কখন দেহের নানাবিধ যন্ত্রে একই সময়ে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকার বিকাশ হইতে পারে। সাধারণতঃ বীজাণু-সংক্রামিত কোন গ্রন্থি (gland) ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় বিগলিত হইয়া শিরাতে পতিত হইলে বহুসংখ্যক বীজাণু রক্তের সহিত দেহের নানা অঙ্গে নীত হয় এবং তাহাতে এই প্রকার যক্ষ্মার (Miliary Tuberculosis) উদ্ভব হইয়া থাকে। শিশুকালেই এরূপ অবস্থা বেশি ঘটিয়া থাকে।

২। কোন কোন ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক গুটিকা একসঙ্গে মিলিত হইয়া যায় এবং তাহাদের অভ্যন্তরে ধ্বংসের ক্রিয়া প্রাধান্যলাভ করে। উহাতে পরিশেষে গর্তের (cavity) উদ্ভব হইয়া থাকে।

৩। কোন কোন স্থলে, বিশেষতঃ সন্ধিস্থলে, যক্ষ্মাবীজাণুর আক্রমণ ঘটিলে তথায় এক প্রকার দানাদার পর্দার (Granulation tissue) আবির্ভাব হইয়া থাকে।

৪। কোন কোন অবস্থায় যক্ষ্মার গুটিসমূহ অতি ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়া থাকে এবং উহাদের চারিপাশে সূত্রবৎ তন্তুর (Fibrous tissue) আধিক্য হইয়া থাকে, এই শ্রেণীর যক্ষ্মা (fibroid Phthisis) দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয়।

৫। কোন কোন অবস্থায় বহুসংখ্যক গুটি উদ্ভূত হয় এবং গুটি-সমূহ হইতে এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। যক্ষ্মাবীজাণুজ মেনিন্‌জাইটিস্, প্লুরিসি প্রভৃতি রোগে এইরূপে প্রচুর পরিমাণে রস নিঃসৃত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ প্রতিরোধক শক্তির আধিক্য থাকিলে গুটিকার উদ্ভবের ও উহাদের চারিদিকে সূত্রবৎ তন্তুর আবির্ভাবের সুবিধা হইয়া থাকে, আর প্রতিরোধক শক্তির খর্বতা ঘটিলে জীবকোষসমূহের ধ্বংসের ও রসাদিস্রাবের প্রাবল্য হইয়া থাকে।

আবদ্ধবীজাণু যক্ষ্মা (Closed Tuberculosis)
উন্মুক্তবীজাণু যক্ষ্মা (Open Tuberculosis)

রোগীর দেহ হইতে যক্ষ্মাবীজাণু বাহিরে নির্গত না হইতে পারিলে তাহাকে আবদ্ধবীজাণু যক্ষ্মা বলে। এ সব রোগী হইতে অন্যে সংক্রামিত হয় না।

রোগীর শ্লেষ্মা বা দেহনিঃসৃত অন্য কোন পদার্থের সহিত যক্ষ্মা-বীজাণু বাহিরে নির্গত হইলে তাহাকে উন্মুক্তবীজাণু যক্ষ্মা বলে। এরূপ রোগী হইতেই অন্যে সংক্রামিত হয়।

যক্ষ্মা পুরুষানুক্রমিক রোগ নহে

এ রোগটি পুরুষানুক্রমিক নহে। জন্মগ্রহণের * পর শিশু এ বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ জন এ বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

মাতাপিতার বা বাড়ীতে অন্য কোন নিকট আত্মীয়ের ক্ষয়রোগ থাকিলে নবজাত শিশুকে নানাবিধ কারণে প্রভূত পরিমাণ যক্ষ্মা-বীজাণুযুক্ত আবেষ্টন মধ্যে থাকিতে হয়। এ কারণেই অসহায় শিশু অচিরে এ দুরন্ত রোগে তীব্রভাবে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জন্মমাত্র শিশুকে এরূপ প্রতিকূল আবেষ্টন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পৃথকভাবে পালন করিবার বন্দোবস্ত করা ভিন্ন তাহাকে এ দারুণ রোগের হাত হইতে রক্ষা করিবার আর উপায় নাই। সাধারণতঃ এ উপায় অবলম্বন করা হয় না বলিয়াই এরূপ শিশুর অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে, এবং তাহাতে লোকে মনে করে যে এ রোগটী পুরুষানুক্রমিক। কিন্তু এরূপ ধারণা ঠিক নহে। ফ্রান্সে মাতার ক্ষয়রোগ থাকিলে জন্মমাত্র শিশুকে মাতার নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিয়া পৃথকভাবে শিশুকে পালনের বন্দোবস্ত করিয়া বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত গাভীর বৎসকে জন্মমাত্রই মাতার নিকট হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্যত্র সুস্থ গাভীর দুগ্ধে পালন করিলে সেই বৎসের যক্ষ্মা হইবার সম্ভাবনা সুস্থ গাভীর বৎস হইতে

* গর্ভের ফুলের (Placenta) মাধ্যমে যদিও ভ্রূণদেহে এই বীজাণু সঞ্চারিত হওয়া সম্ভবপর ঘটে, তথাপি ইহা অতি কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে; সুতরাং কার্য্যতঃ উহার কোন গুরুত্ব নাই।

অধিক হয় না। এই রোগটী পুরুষানুক্রমিক না হইলেও মাতাপিতা উভয়েরই এ রোগ থাকিলে এই রোগের প্রতিরোধক শক্তির ক্ষীণতা সন্তানে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ইহাকে পুরুষানুগত পূর্বপ্রবণতা (Pre-disposition) বলা যাইতে পারে।

যক্ষ্মারোগে বয়সের প্রভাব

এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে যক্ষ্মা-সংক্রমণ এবং ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে যক্ষ্মারোগের বিকাশের বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শিশুরা অসংক্রামিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের স্বোপার্জিত কোন অনাক্রম্যতা থাকে না *। কিন্তু তাহাদের গ্রহণশীলতা (susceptibility) থাকে। এজন্য যথেষ্ট পরিমাণ বীজাণুর সম্মুখে আপতিত হইলে তাহারা সহজেই এ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। ২-৩ বৎসর বয়সে এ রোগ হইলে উহার অতি দ্রুত অবাধ বিকাশ হয় এবং উহা অত্যন্ত উগ্র ধরণের (Acute Miliary Tuberculosis) হইয়া অল্প সময় মধ্যেই মারাত্মক হয়।

দশ বৎসর বয়স মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী যক্ষ্মা (Chronic Pulmonary Tuberculosis) প্রায় দেখা যায় না। ২-১০ বৎসর বয়সে লসীকাগ্রন্থি, সন্ধিস্থল, অস্থি প্রভৃতি অঙ্গের মৃদু ধরণের যক্ষ্মাই সাধারণতঃ হইয়া থাকে, ১৪ বৎসরের পর হইতেই সাধারণতঃ ক্ষয়রোগ হয়। ১৫ ৪৫ বৎসর বয়স মধ্যেই ক্ষয়রোগ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়।

একবার কোনরূপ যক্ষ্মারোগে ভুগিয়া যে সকল শিশু বাঁচিয়া যায় এবং শৈশবে যাহাদের মৃদু সংক্রমণ ঘটে, তাহাদের এ রোগ সম্বন্ধীয়

* সভ্য জগতের শিশুদের পূর্বপুরুষলব্ধ জাতিগত সামান্য অনাক্রম্যতা থাকে।

কতকটা অনাক্রম্যতা জন্মে। বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় পুনরায় তাহারা যক্ষ্মা-বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহাদের শিশুদের মত আর তীব্র (acute generalised) ধরণের যক্ষ্মা হয় না, তখন তাহাদের দীর্ঘকাল-স্থায়ী ফুসফুসের যক্ষ্মা (Chronic Pulmonary Tuberculosis) হইয়া থাকে। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এ রোগ বড় দেখা যায় না, এজন্য বাল্যকালে এ বীজাণু-সংক্রমণে তাহাদের এ রোগ সম্বন্ধীয় অনাক্রম্যতা জন্মে না। যদি তাহাদের কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রথমে সভ্য জগতে আসিয়া যক্ষ্মারোগীর সংসর্গে বসবাস করে তবে সে সহজেই শিশুদের ন্যায় তীব্র ধরণের যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া অল্প সময় মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হয়। সভ্য জগতে প্রায় সকলেই সাধারণতঃ বাল্যকালে যক্ষ্মাবীজাণুর মৃদু সংক্রমণের ফলে এ রোগ সম্বন্ধীয় কতকটা অনাক্রম্যতা লাভ করিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই অনাক্রম্যতা চিরজীবনস্থায়ী হইতে পারে। কিন্তু সচরাচর উহা এত দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয় না। অনাহার, অনিদ্রা, অতিশ্রম, সুরাপান, দুশ্চিন্তা, নানাবিধ অনিয়মে স্বাস্থ্যবিধির লঙ্ঘন, হাম, হুপিং কফ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি ব্যারামে, অথবা শীতাতপ আতিশয্যে, উপযুক্ত আহারের অভাবে বা অন্য কোন কারণে দুর্বলতা হেতু রোগ-প্রতিরোধক শক্তির অবনতি ঘটিলে এই অনাক্রম্যতা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যক্ষ্মা-হাসপাতালের শুশ্রূষাকারী, ডাক্তার বা ছাত্রগণের এ বীজাণু-সংক্রমণের সুযোগ ও সম্ভাবনা খুব বেশি। তথাপি তাহারা অন্য জনসাধারণ হইতে অধিক পরিমাণে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয় না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের যক্ষ্মারোগ থাকিলে, অন্যজন রোগীর সহিত এত ঘনিষ্ঠরূপে বসবাস করা সত্ত্বেও সহজে এ রোগে আক্রান্ত হয় না। কিন্তু দম্পতির মধ্যে একজনের উপদংশরোগ থাকিলে অন্যজন উহার হাত এড়াইতে পারে না।

বাল্যকালে মৃদুভাবে বীজাণু-সংক্রমণ হেতু অনাক্রম্যতা অর্জনের ফলেই লোক বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় উক্ত রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে।

দীর্ঘকালস্থায়ী যক্ষ্মারোগ (chronic Pulmonary Tuberculosis) পূর্ব-জীবনে আংশিক অনাক্রম্যতা অর্জনেরই নিদর্শন; পূর্বজীবনে আংশিক অনাক্রম্যতা লাভ না হইলে, প্রথমে প্রভূত পরিমাণ বীজাণু-সংক্রমণের ফলে লোকের তীব্র (acute) যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

সেই পূর্ব-অর্জিত অনাক্রম্যতা সম্পূর্ণ হইলে এ রোগ হওয়াই সম্ভব হইত না। উহা অসম্পূর্ণ বলিয়াই উহাতে সকল অঙ্গের সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। এ রোগ সম্বন্ধে ফুসফুসই দেহমধ্যে সর্বাপেক্ষা কম সুরক্ষিত, এজন্য উহাই সর্বাগ্রে এ রোগে আক্রান্ত হয় এবং তখনও দেহের অন্যান্য যন্ত্র এ রোগের আক্রমণ বারণ করিতে সক্ষম থাকে।

দীর্ঘকালস্থায়ী যক্ষ্মা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও হয় না। পরীক্ষামূলকভাবে অন্য জন্তুর দেহে যে যক্ষ্মারোগ সৃষ্টি করা হয় এবং শিশুদের স্বভাবতঃ যে যক্ষ্মারোগ জন্মে, তাহাতে যক্ষ্মার সম্পূর্ণ অবাধ বিকাশ হয় এবং উহা অতিশয় উগ্রভাব ধারণ করে।

বীজাণু ব্যতীত অন্যান্য কারণের প্রভাব

যক্ষ্মাবীজাণু এ রোগের মুখ্য কারণ হইলেও, উহাই একমাত্র কারণ নহে। অন্যবিধ অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান না থাকিলে, কেবল এই বীজাণুর উপস্থিতিতে এ রোগের উৎপত্তি হইতে পারে না। অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণগুলি এখানে আলোচিত হইল।

ধাতুগত পূর্বপ্রবৃত্তি (Predisposition)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এ রোগটি পুরুষানুক্রমিক না হইলেও মাতাপিতা উভয়ের এ রোগ থাকিলে সন্তানের এ রোগ-প্রতিরোধক শক্তি স্বভাবতঃই অতিশয় ক্ষীণ হইয়া থাকে। উহাকে ধাতুগত পূর্ব-প্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে।

উপজীবিকা

যে সকল উপজীবিকায় আবদ্ধ ঘরে এবং ধূলিপূর্ণ স্থানে একসঙ্গে অনেক লোকের কাজ করিতে হয়, এরূপ বৃত্তি এ রোগ সৃষ্টির অনুকূলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অনেক কলকারখানায় এরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সমাবেশ দেখা যায়।

দারিদ্র্যদোষের প্রভাব

দারিদ্র্যদোষ নানা কারণে যক্ষ্মারোগ সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা আনয়ন করিয়া থাকে। দরিদ্রতানিবন্ধন অনেক লোক উপযুক্ত আবাস, গ্রাসাচ্ছাদন, শিক্ষা ও বিশ্রাম লাভের বন্দোবস্ত করিতে অক্ষম; কাজেই তাহাদের রোগ-প্রতিরোধক শক্তি ক্ষীণ হইয়া থাকে এবং এজন্য তাহারা সহজেই রোগগ্রস্ত হয়।

অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহ ও কার্যস্থলের প্রভাব

অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহ ও কার্যস্থলের প্রভাব এ রোগ বিস্তারের বিশেষ সহায়ক। যথেষ্ট বিশুদ্ধ বায়ু ও আলো সমাগমের বন্দোবস্ত-শূন্য এবং

অপর্যাপ্ত ধূলিকণাপূর্ণ এক ঘরে বহুলোকের বাস স্বাস্থ্যহানির এক প্রধান কারণ। এই সমুদয় কারণে এক দিকে লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং অপর দিকে রুগ্ন ও সুস্থ ব্যক্তির পরস্পরের সান্নিধ্যে বাস হেতু সংক্রামক ব্যাধি বিস্তারের সুবিধা হয়।

অন্যরোগ ও অবস্থার প্রভাব

হাম, হুপিংকফ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সহজাত হৃদ্‌রোগ, বিশেষতঃ ফুসফুসাধিগ ধমনীর সঙ্কোচন (stenosis of pulmonary artery), মধুমেহ (Diabetes) প্রভৃতি রোগের যক্ষ্মারোগ সৃজনে বিশেষ প্রভাব আছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ অনেক স্থলেই এ সব রোগের পর যক্ষ্মারোগের লক্ষণ বিকাশ পাইয়া থাকে। প্রসবের পরও অনেক সময় যাপ্য যক্ষ্মা প্রকটিত হইতে দেখা যায়।

অনিদ্রা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, দুশ্চিন্তা এবং তদুপরি সুরাপানাদি পাপাচরণ ইত্যাদি ব্যাপারে যে দৈহিক ও মানসিক অবসাদ ঘটে, তাহার ফলে যক্ষ্মারোগ সৃজনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি হয়।

যক্ষ্মারোগে মৃত্যুসংখ্যা

আমাদের দেশে এ রোগ সম্বন্ধীয় মৃত্যুসংখ্যার কোন নির্ভরযোগ্য তালিকা সংগ্রহ করা সুকঠিন। অনেক সময় অজ্ঞতাহেতু এ রোগ মৃত্যুর কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হয়, আবার কখন কখন ইচ্ছাপূর্বক প্রকৃত রোগ গোপন করার উদ্দেশ্যেও মৃত্যুর কারণ যক্ষ্মা বলিয়া লিখানো হইয়া থাকে। যাহা হউক, নানা স্থান হইতে প্রকাশিত তালিকার

বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, এ রোগে আমাদের দেশে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক অধিক লোকের মৃত্যু ঘটে। যৌবনে ও মধ্য বয়সেই এ রোগে মৃত্যুসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক।

নিম্নে কলিকাতায় এ রোগে মৃত্যুসংখ্যা প্রদত্ত হইল—

কলিকাতায় যক্ষ্মারোগে মৃত্যুসংখ্যা

সন			মৃত্যুসংখ্যা
১৯৩০	...	...	২৭৫৬
১৯৩৩	...	...	২৮৮৭
১৯৩৪	...	...	৩০৫৩
১৯৩৫	...	...	৩১০৩
১৯৩৬	...	...	৩১৪১
১৯৩৭	...	...	৩৩৬৪

বয়স		পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মৃত্যুসং
১০-১৫ বৎসর	...	১ : ২
১৫-২০ „	...	১ : ৩
২০-৩০ „	...	১ : ২

কলিকাতার সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে শতকরা দশটির কারণ যক্ষ্মারোগ। এ রোগে সর্বাপেক্ষা অধিক মৃত্যু ১৫ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স মধ্যেই ঘটে। মনুষ্য-জীবনে এই কালই সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান, এই বয়সেই মানবের উদ্যমশীলতা, কর্মশীলতা, উপার্জনশীলতার পূর্ণ বিকাশের এবং জীবনের নানাবিধ সুখসম্ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিবার প্রকৃষ্ট সময়। আর এই বয়সেই এত লোক অকালে কালকবলে পতিত

হয়। ইহা যে দেশের উন্নতির পক্ষে কত পরিপন্থী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

কলিকাতায় ক্রমশঃ এ রোগে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এ সম্বন্ধে জনসাধারণের ও স্বাস্থ্যবিভাগের সকলেরই সচেতন হওয়া সঙ্গত।

নানাবিধ বিবরণ হইতে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, বঙ্গদেশে বৎসরে প্রায় এক লক্ষ লোকের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু ঘটে এবং প্রায় দশ লক্ষ লোক ইহাতে নানারূপে কষ্ট পায়।

সমগ্র বৃটিশ ভারতে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুসংখ্যা

সব ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ বিশ্বস্তরূপে নির্ণীত হয় না, এজন্য বাস্তবিক যক্ষ্মারোগে কত লোক মরে, তাহার প্রকৃত সংখ্যা স্থির করা কঠিন। যে সব ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ নিরূপিত হইয়াছিল সেই সব তালিকা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ১৯৩৪ ইং সনে ৫১০০০ হইতেও অধিক সংখ্যক লোকের বৃটিশ ভারতে যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হইয়াছিল। যে সকল ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই তাহার মধ্যেও সে বৎসর যক্ষ্মারোগে মৃত্যুসংখ্যা তিন লক্ষের কম হইবে না বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সে বৎসর হাসপাতালে ২৫৮০০০ যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা হইয়াছিল। এ রোগে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক নানারূপে ভুগিতেছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

রোগের প্রাথমিক বিকাশ

বীজাণু-সংক্রমণের পর কখন যে রোগ আরম্ভ হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। আমাদের অজানিত ভাবে শৈশবে এই বীজাণুসমূহ দেহে

প্রবেশলাভ করে এবং বহুকাল তথায় যাপ্য অবস্থায় থাকে। পরে তাহারা রোগীর অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। অবশেষে রোগ যখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যায় এবং পূর্ণ মাত্রায় লক্ষণসমূহ বিকাশ পায়, তখন আর রোগের অস্তিত্ব নির্ণয়ে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

এ ব্যাধি বড় দুরারোগ্য। এ রোগে আক্রান্ত হইবার পর যত শীঘ্রই রোগটি সঠিক ধরা যায় এবং চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা যায়, ততই আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা অধিক হয় এবং রোগবিস্তৃতির আশঙ্কা ও সুযোগ সেই পরিমাণে হ্রাস পাইয়া থাকে। এজন্য এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে অবিলম্বে রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা যায়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এ রোগের প্রারম্ভ নানা প্রকারে সূচিত হইতে পারে। আরম্ভের প্রধান লক্ষণসমূহকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

১। স্নায়বিক লক্ষণ—কিছুই ভাল লাগে না, শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ হয়, দেহের ওজন ক্রমশঃ হ্রাস পায়, নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, বিকালে জ্বর হয়, রাত্রিতে ঘর্ম হয়।

২। অজীর্ণতা ও রক্তক্ষীণতার লক্ষণ—ক্ষুধাবোধ হয় না, সময় সময় বমি হয়, চেহারা শীর্ণ, বিবর্ণ ও ক্ষীণরক্ত বোধ হয়, সময়ে সময়ে হৃৎপিণ্ডের কম্পন হয় ও দুর্বলতা বোধ হয়।

৩। কোন কোন সময়ে রক্তমিশ্রিত কফ নিঃসরণই এ রোগের প্রথম লক্ষণ হইয়া থাকে। কফের সঙ্গে রক্ত নিঃসৃত হওয়া এ রোগের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এরূপ রক্ত-নিঃসরণের অন্য কারণ দৃষ্ট না হইলে, ইহা যক্ষ্মারোগের সূচনা বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

৪। দীর্ঘকালস্থায়ী সর্দি এ রোগের একটি সাধারণ লক্ষণ। অনেক

দিবস যাবৎ সর্দি আরোগ্য না হইলে যক্ষ্মা বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে।

৫। ফুসফুসধরা-কলার (Pleura) প্রদাহে বুকের পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা হয়। এরূপ বেদনা অনেক সময়ে যক্ষ্মার সূচনা করিয়া থাকে।

৬। বাগ্‌যন্ত্রের প্রদাহে স্বরভঙ্গ হইলেও অনেক সময়ে যক্ষ্মারোগ সূচিত হইয়া থাকে।

৭। কখনও কখনও ম্যালেরিয়া জ্বরের মত, শীত করিয়া শরীর কাঁপাইয়া জ্বর হয় ও ঘর্ম হইয়া জ্বরত্যাগ হয়; কিন্তু কুইনাইন সেবনে কোন ফল হয় না এবং রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়ার বীজাণুও ধরা পড়ে না। এরূপ ভাবেও যক্ষ্মার বিকাশ হইতে পারে।

এইরূপ নানাবিধ উপসর্গ দ্বারা যক্ষ্মারোগ আরম্ভ হইতে পারে। কোন একটি নিশ্চিত বিশেষ লক্ষণ দ্বারা সব সময়ে এ রোগের প্রারম্ভ সূচিত হয় না। তথাপি মোটের উপর **জ্বর, কাসি** ও দিনে দিনে **দেহের শীর্ণতা** এই তিনটিকে এ রোগের প্রধান লক্ষণ বলা যাইতে পারে।

রোগ নির্ণয়ার্থে শ্লেষ্মাতে বীজাণু পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করা উচিত নহে। একৃস্-রে (X-Ray) পরীক্ষা দ্বারা এ রোগ নির্ণয়ে অনেক সাহায্য হইয়া থাকে। প্রথম অবস্থায়ই এ রোগ নির্ণীত হইলে সুচিকিৎসায় ইহার অগ্রগতি রোধ করা খুব সম্ভব এবং আরোগ্য লাভও সাধ্যায়ত্ত হয়।

সন্দেহজনক অবস্থায় রোগনির্ণয়ার্থে পরীক্ষার ব্যবস্থা

যাহাতে এ রোগের সন্দেহ হইবামাত্রই সুদক্ষ চিকিৎসকদ্বারা ভালরূপে বিনা ব্যয়ে পরীক্ষা করান যায়, স্থানে স্থানে এরূপ পরীক্ষাকেন্দ্র

স্থাপন করা আবশ্যক। ইহাতে জনসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইবে। এরূপ পরীক্ষাকেন্দ্রে, পরীক্ষার পর রোগ নির্ণয় হইলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বর্তমানে কলিকাতার নিকট নিম্নলিখিত স্থানে এরূপ পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত আছে এবং সে সব স্থানে চিকিৎসারও বন্দোবস্ত আছে।

১। চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল, ২৪নং গোরাচাঁদ রোড, ইটালী।

২। হাবড়া জেনারেল হাসপাতাল, হাবড়া।

৩। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কলেজ ষ্ট্রীট।

৪। ইসলামিয়া হাসপাতাল, ১নং বলাই দত্ত ষ্ট্রীট, কলুটোলা।

৫। সার্ গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউট, ২৯নং গুরুদাস রোড, নারিকেলডাঙ্গা।

৬। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, বেলগাছিয়া।

প্রথম অবস্থায়ই রোগনির্ণয় ও চিকিৎসার প্রয়োজন

সাধারণতঃ যক্ষ্মারোগ নির্ণয় করা বস্তুতঃ বিশেষ কঠিন নহে, কিন্তু চিকিৎসা করা কঠিন। এ রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। স্বভাবতঃই কখন কখন রোগের অবস্থার উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়া থাকে। এজন্য রোগের অবস্থার উন্নতি দেখিলেই সব সময় কোন বিশেষ ঔষধের সুফল বা রোগের অবস্থার কোন উন্নতি না হইলেই কোন ঔষধের নিষ্ফলতা অনুমান করা ঠিক নহে। এ রোগের চিকিৎসাও দীর্ঘকাল-ব্যাপী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু অনেক রোগীই এত ধৈর্য অবলম্বন না করিয়া আশু ফল লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এজন্য এ সব রোগী প্রায়ই বিজ্ঞাপনদাতা ও হাতুড়ে চিকিৎসকের হাতে পড়িয়া অযথা অনেক মূল্যবান সময় ও অর্থ নষ্ট করে।

রোগের প্রাথমিক বিকাশ দৃষ্ট হইলেই এ রোগের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করিতে হইবে। রোগের লক্ষণ বিকাশেই বুঝা যায় যে, দেহের রক্ষণকারী শক্তির ক্ষীণতা ঘটিয়াছে এবং বীজাণুসমূহের ক্ষমতা প্রবলতর হইয়াছে। এ অবস্থায় বিশেষ মনোযোগের সহিত বিবিধ উপায়ে দেহের রোগ-প্রতিরোধক শক্তি বৃদ্ধি না করিতে পারিলে, রোগের অগ্রগতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হইবে না। প্রথম অবস্থায় রোগের অবহেলা করিতে নাই, এরূপ করিলে রোগ বৃদ্ধি হইবেই। মনে রাখিতে হইবে যে, যে রোগ এক সময় মারাত্মক হয়, তাহাও পূর্বে প্রথম অবস্থায় সামান্যই ছিল, কিন্তু সে সময়ে যথেষ্ট মনোযোগের সহিত চিকিৎসার অভাবে পরে উহা এরূপ আশাহীন কঠোর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় মনোযোগের অভাবই পরিশেষে রোগের উৎকট অবস্থা আনয়ন করে। প্রথম অবস্থায় যত্নপূর্বক চিকিৎসা করিলে অধিকাংশ স্থলেই এ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগনির্ণয় এবং সে অবস্থায় বিশেষ মনোযোগের সহিত চিকিৎসা করা—এই দুইএর উপরই যক্ষ্মারোগের আরোগ্য নির্ভর করে। প্রথমেই উপযুক্ত চিকিৎসা অবলম্বন করিতে না পারিলে, কেবল রোগনির্ণয়ে কোন ফল হইবে না।

এ রোগের কোন এক বিশেষ নিশ্চিত ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কোন অলৌকিক ক্রিয়াবলে, বা যাদুমন্ত্রে এ রোগ আরোগ্য করা সম্ভব নহে। কেবল সুচিকিৎসকের উপদেশ বিশ্বস্তরূপে ধৈর্য ও উৎসাহের সহিত পালন করিলে এ দারুণ রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভবপর হইতে পারে। এজন্য যাহাদের যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা আছে এবং যাহাদের এ রোগ

সমীক্ষণ করিয়া বিশেষ ভাবে জানিবার সুবিধা আছে, এরূপ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গেই এ রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ করা সঙ্গত।

রোগের গতি

এক দিকে আক্রমণকারী বীজাণুর মাত্রা ও তীব্রতার পরিমাণ, এবং অপর দিকে দেহে প্রতিরোধক শক্তির পরিমাণ এ উভয় পক্ষের আপেক্ষিক সামর্থ্যের উপর রোগের উৎপত্তি ও তাহার ভাবী গতি নির্ভর করে। এই দুই বিরোধী শক্তির পরিমাণের সমাবেশ প্রত্যেক রোগীর মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, এবং উহা সর্বদাই নানা কারণে পরিবর্তিত হইতেছে। এজন্য রোগের গতিও প্রত্যেক রোগীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে। সুতরাং মূল রোগ এক হইলেও উহার গতি ও ভাবী ফল ভিন্ন ভিন্ন রোগীতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রতিকারের উপায়

যক্ষ্মা একটি দীর্ঘকালস্থায়ী কঠিন রোগ। এই কালরোগে বহুলোকের মৃত্যু ঘটে, বহুলোকের কর্মশক্তি ও উপার্জনশক্তি ক্ষীণ হয় এবং বহুলোক নিজে অনেক ক্লেশ পায় ও অন্যেরও অনেক কষ্টের কারণ হয়। কি উপায়ে এই নিদারুণ ব্যাধির প্রতিকার করা যায়? ইহার প্রতিকারকল্পে নিম্নোক্ত কয়েকটিকে মূল উপায় বলা যাইতে পারে।—

১। যক্ষ্মাসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রচার ও অজ্ঞতা দূরীকরণ।

২। বীজাণু-সংক্রমণ হইতে সংরক্ষণ।

৩। রোগ উৎপত্তির প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক ও রোগ-প্রতিরোধক আভ্যন্তরিক অবস্থার উৎকর্ষ বিধান।

৪। বীজাণু বিনাশ।

৫। সন্দেহজনক অবস্থায় রোগনির্ণয়ার্থে পরীক্ষার ব্যবস্থা ও রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা।

৬। রোগনিবৃত্তির পর হৃতস্বাস্থ্যের উদ্ধারের উপায় অবলম্বন করা।

যক্ষ্মাসম্বন্ধীয় জ্ঞানের প্রচার ও অজ্ঞতার দূরীকরণ

যক্ষ্মাসম্বন্ধীয় আধুনিক বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের বহুলপ্রচারে এই বিষয়ে লোকের ভ্রান্ত সংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করাই প্রথম ও প্রধান কাজ। ইহার ফলে দুর্বলতা ও অবিশ্বাস তিরোহিত হইয়া জনসাধারণের মনে

আশার সঞ্চার ও আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা হইবে এবং অভীষ্ট সাধনে উৎসাহ বর্ধিত হইবে। সুতরাং তাহাতে যক্ষ্মাবিরোধী অভিযানের প্রধান বিঘ্ন দূর হইয়া উন্নতির পথ সহজ হইবে।

বীজাণু-সংক্রমণ হইতে সংরক্ষণ

বয়স অনুসারে এ রোগের প্রতিকারকল্পে উপায় অবলম্বনে কতকটা বিভিন্নতা আবশ্যক।

শৈশবকালের বিধি

বীজাণু-সংক্রমণ হইতে সংরক্ষণ, এই নীতিটি শিশুদের বেলায়ই বিশেষ প্রযোজ্য, তাহাদের এ রোগসম্বন্ধীয় গ্রহণশীলতা আছে, কিন্তু তাহাদের রোগ-প্রতিরোধক শক্তি অতিশয় ক্ষীণ থাকে। এজন্য জন্ম হইতে তিন বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত শিশুদিগকে সর্বতোভাবে এ বীজাণু-সংক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

সাধারণতঃ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত মাতার স্তন্যপানে শিশু সংক্রামিত হয় না, কারণ স্তনে যক্ষ্মাক্ষত না থাকিলে মাতৃস্তন্যে বীজাণু সঞ্চারিত হয় না। কিন্তু তাহার শ্লেষ্মাস্থিত অসংখ্য বীজাণু ব্যতীত কাসিবার ও কথা বলিবার কালে ক্ষয়রোগগ্রস্ত মাতার মুখ হইতেও প্রভূত পরিমাণ বীজাণু নিঃসৃত হইয়া তাহার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় রুগ্ন মাতার নিকটে থাকিলে নবজাত শিশুর এ রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ অসম্ভব। এজন্য মাতার যক্ষ্মারোগ থাকিলে শিশুর জীবন-রক্ষার্থে জন্মমাত্র তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে লালনপালনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, নতুবা এরূপ শিশুর অকালমৃত্যু অনিবার্য হইবে।

মুখে চুম্বন ভয়াবহ

মুখের উপর চুম্বন করিলে রোগীর মুখনিঃসৃত বীজাণু দ্বারা অন্যে সংক্রামিত হইতে পারে। এজন্য যক্ষ্মারোগীর কাহারও মুখে চুম্বনের অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। শিশুদের শিরশ্চুম্বন প্রথা বরং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

দূষিত শ্লেষ্মা ও আর্দ্রকণা জাত আশঙ্কার প্রতিকার

যক্ষ্মারোগীর বীজাণুদূষিত শ্লেষ্মা এবং হাঁচিবার ও কাসিবার সময় তাহার নাসিকা ও মুখ নিঃসৃত বীজাণুযুক্ত আর্দ্রকণা হইতেই অন্যে সংক্রামিত হইয়া থাকে। হাঁচিবার ও কাসিবার কালে রোগী একখণ্ড কাগজের টুকরা মুখের সম্মুখে ধরিলে এ আশঙ্কা নিবারিত হইতে পারে। পরে অবশ্য এই কাগজখণ্ড পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

পিতার যক্ষ্মারোগ থাকিলে শিশুর জন্মের পর ২।৩ বৎসর কালের জন্য তাহার স্থানান্তরে বাসের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বাড়ীতে যদি আর কোন যক্ষ্মারোগী থাকে, তবে নবজাত শিশুর বা উক্ত রোগীর স্থানান্তর বাসের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। মোট কথা, যে বাড়ীতে কোন ক্ষয়রোগী আছে, সে বাড়ীতে নবজাত শিশুকে রাখা বিপজ্জনক। এরূপ করিলে অসহায় শিশু অচিরেই নানা প্রকারে প্রভূত বীজাণু-সংক্রমণে রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইবে।

শিশুদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ জন্য লোক নির্বাচনে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। পুরাতন কাসরোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তিই এ কার্যে নিয়োগের উপযুক্ত হইবে না।

বাড়ীর অবস্থা অন্যরূপে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল হইলেও যদি শিশুর

বীজাণু-সংক্রমণের কোন সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাহার যক্ষ্মা হইবে না; কিন্তু অন্য প্রকারে বাড়ীর অবস্থা স্বাস্থ্যবিধান অনুসারে আদর্শ-স্থানীয় হইলেও যদি শিশুর প্রভূত বীজাণুপূর্ণ আবেষ্টনের মধ্যে আপতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে উহার মারাত্মক যক্ষ্মা হইবারই আশঙ্কা থাকিবে।

দুগ্ধস্থ বীজাণু সংক্রমণের প্রতিকার

গো-দুগ্ধ হইতেও শিশুদের বীজাণু-সংক্রমণ ঘটিয়া থাকে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য উত্তমরূপে জ্বাল দিয়া অন্ততঃ তিন মিনিট কাল না ফুটাইয়া কোন দুগ্ধই পানের জন্য ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না।

তিন বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত শিশুদিগকে বীজাণু-সংক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিলে বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় যক্ষ্মারোগ হওয়ার সম্ভাবনাও হ্রাস পাইবে।

৪।৫ বৎসর হইলে শিশুগণ নানাপ্রকার লোকের সহিত মিশিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদিগকে বীজাণু-সংক্রমণ হইতে রক্ষা করা সহজ নহে। কিন্তু সে বয়সে তাহাদের প্রতিরোধক শক্তি স্বভাবতঃই বৃদ্ধি হয় এবং সে বয়সে মৃদু বীজাণু-সংক্রমণ অনিষ্টজনক নহে, বরং তাহাতে এ রোগসম্বন্ধীয় কতকটা অনাক্রম্যতা জন্মে। ৪ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই শতকরা প্রায় ৯০ জনের এ বীজাণু-সংক্রমণ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু এ বয়সের তরুণদের মধ্যে এ রোগ ও এ রোগে মৃত্যু-সংখ্যা খুব কম।

সংক্রমণ ব্যতীত কোন রোগবিশেষের অনাক্রম্যতা জন্মিতে পারে না। ৪ হইতে ১৫ বৎসর বয়স মধ্যে যক্ষ্মাবীজাণুর মৃদু সংক্রমণে

আমাদের দেহে এ রোগসম্বন্ধীয় বিশিষ্ট অনাক্রম্যতা উদ্ভবের সুযোগ ঘটিয়া থাকে। এই বয়সে যদি মানবদেহে একসঙ্গে অধিক মাত্রায় তীব্র বীজাণু-সংক্রমণ ঘটে, তবে তাহার উগ্র ধরণের মারাত্মক যক্ষ্মা হওয়ারই সম্ভাবনা হয়; আর যদি অল্প মাত্রায় মৃদু সংক্রমণ ঘটে, তবে তাহার প্রতিরোধক শক্তির প্রভাবে বীজাণুসমূহ পরাভূত হয় এবং ইহার ফলে তাহার দেহে এ রোগসম্বন্ধীয় বিশিষ্ট অনাক্রম্যতা লাভ হইয়া থাকে। এজন্য এ বয়সে এরূপ মৃদু সংক্রমণের ফল শুভজনকই হইয়া থাকে। কখন কখন এরূপে অর্জিত অনাক্রম্যতা চিরজীবন স্থায়ী হইতে পারে। কখন কখন আবার নানা কারণে আমাদের দেহের রক্ষণকারী শক্তির অবনতি ঘটিলে এই অনাক্রম্যতা হ্রাস পাইতে পারে বা একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বিবিধ উপায়ে এই শক্তির অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করা এবং যথাসম্ভব ইহার উন্নতি বিধান করাই যক্ষ্মা প্রতিকারের মূলমন্ত্র।

কৃত্রিম উপায়ে অনাক্রম্যতা সৃজন

প্রফেসর কাল্‌মেট (Calmette) সাহেব গো-যক্ষ্মাবীজাণুর তীব্রতার হ্রাস করিয়া এ রোগ-প্রতিষেধক এক প্রকার পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহার প্রয়োগে শিশুদের এ রোগ-প্রতিষেধক শক্তি জন্মে বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। ইহা আশাপ্রদ, কিন্তু এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন স্থিরসিদ্ধান্ত হয় নাই।

বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থার বিধি

বাল্যাবস্থার প্রথম ভাগে অর্থাৎ জন্ম হইতে তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত সংক্রমণ নিবারণ উদ্দেশ্যে যক্ষ্মারোগীর সংস্রব পরিত্যাগ জন্য

যেরূপ কড়াকড়ি বন্দোবস্তের আবশ্যক, বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় সেরূপ বন্দোবস্তের আর তেমন প্রয়োজন নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ৪ হইতে ১৫ বৎসর বয়স মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ জন লোকের এ বীজাণু-সংক্রমণ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ১৬ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বেই সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া একরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বয়ঃপ্রাপ্তদের যক্ষ্মারোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, উহা প্রাথমিক সংক্রমণের ফলে উৎপন্ন হয় না। প্রাথমিক সংক্রমণের ফলে যে যক্ষ্মা হয়, তাহা অতিশয় উগ্র ধরণের এবং প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে; উহা শিশুদের মধ্যেই বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। যদি বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির যক্ষ্মা প্রাথমিক সংক্রমণের ফলে সংঘটিত হয়, তবে তাহাও উগ্র ধরণের ও মারাত্মক হইয়া থাকে; এরূপ যক্ষ্মা নবাগত প্রাপ্তবয়স্ক আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্বে বীজাণু-সংক্রমণ না ঘটিলে দীর্ঘকালস্থায়ী (chronic) যক্ষ্মা হয় না। সভ্যদেশের লোকের ৪ হইতে ১৫ বৎসর বয়স মধ্যে যে বীজাণু-সংক্রমণ ঘটে, তাহার ফলে দেহে আংশিক অনাক্রম্যতার উদ্ভব হইয়া থাকে, এজন্য বাহির হইতে সংক্রামিত ব্যক্তির দেহে আর বীজাণু প্রবেশ করিতে পারে না। এই প্রাথমিক সংক্রমণের বীজাণুসমূহ দেহে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকে, কোন কারণে দেহের রক্ষণকারী শক্তির অবনতি ঘটিলে সেই নিষ্ক্রিয় বীজাণুসমূহ সক্রিয় হইয়া রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এ রোগের প্রতিকার উদ্দেশ্যে যাহাতে দেহের রোগ-প্রতিরোধক শক্তির ক্ষুণ্ণতা না ঘটিয়া বরং ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা দৃঢ় অধ্যবসায় ও উৎসাহ সহকারে প্রয়োগ করিতে হইবে।

কিন্তু যাহারা জীবনে পূর্বে আর কখনও এ বীজাণু দ্বারা সংক্রমিত

হয় নাই, তাহাদের পক্ষে বীজাণু-সংক্রমণের বিরুদ্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাল্যকালের শেষভাগে অর্থাৎ ৪-১৫ বৎসর বয়সে প্রাথমিক মৃদু বীজাণু-সংক্রমণেই অনাক্রম্যতা জন্মে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় প্রাথমিক সংক্রমণের ফলে অনাক্রম্যতা অর্জিত হয় না।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও প্রতিরোধক শক্তির উৎকর্ষ বিধান

এ রোগের মুখ্য কারণ, আর আমাদের দেহ এ রোগ বিকাশের ক্ষেত্র। বীজাণু আমাদের দেহে কেবল প্রবেশ করিলেই রোগ হয় না, রোগ উৎপত্তির জন্য এক দিকে যেমন বীজাণুর মাত্রা ও তীব্রতা যথেষ্ট হওয়া চাই, অপর দিকে আবার তেমনই আমাদের দেহের অবস্থা এই বীজাণুপুষ্টির পক্ষে অনুকূল হওয়া আবশ্যক। সুবীজ ও সুক্ষেত্রের সমাবেশ চাই। ঊষর ক্ষেত্রে সুবীজ বপন করিলেও উহা নিষ্ফল হইয়া যায়। স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিনিষেধসমূহ সর্বদা যথাশক্তি পালন করিয়া আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও প্রতিরোধক শক্তির উৎকর্ষ সাধন দ্বারা এরূপ প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে, যেন দেহে বীজাণু প্রবেশ করিলেও রোগ জন্মিতে না পারে।

এখানে তদনুকূল কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইল।

:কর খাদ্যের ব্যবস্থা

খাদ্য হইতেই আমাদের দেহে শক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্যের অল্পতা ঘটিলে প্রতিরোধক শক্তির ক্ষীণতা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এজন্য যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা

করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে, নতুবা এ রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভবপর হইবে না। ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ অপেক্ষা ভাল খাবার সংগ্রহের ব্যবস্থা করা অধিক আবশ্যক, কিন্তু সাধারণতঃ লোকে ইহার বিপরীত আচরণই করিয়া থাকে। ইহার সংশোধন করা আবশ্যক।

উপযুক্ত বিশ্রাম ও অতিরিক্ত পরিশ্রম

উপযুক্ত বিশ্রামের অভাবে ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের চাপে আমাদের প্রতিরোধক শক্তি অতিশয় হ্রাস পায়। সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ এক দিন সকলেরই বিশ্রাম করা আবশ্যক। বিশ্রামের দিন স্ফূর্ত্তির সহিত আমোদে ও ক্রীড়া-কৌতুকে কাটাইতে পারিলে ভাল হয়।

মিতাচার

কোন কার্যই অতিরিক্ত করা ভাল নহে, সর্বদা সকল বিষয়েই মিতাচারী হওয়া আবশ্যক। সুরাপানাদি অভ্যাস লোকের অনেক অনিষ্টের মূল। নানা প্রকারে ইহার প্রভাবে স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি ঘটিয়া থাকে। ইহা সর্বথা পরিহার করিতে হইবে।

বাল্যবিবাহ

আমাদের স্বাস্থ্যের উপর বাল্যবিবাহের অনিষ্টজনক ফল সকলেরই সুবিদিত। এখন সমাজের গতি বিপরীত দিকে দেখা যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

সদভ্যাস গঠন

সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে—বাল্যকাল হইতেই এই অভ্যাস যত্নপূর্বক শিক্ষা করিতে হইবে। পেন্‌সিল, অঙ্গুলি ইত্যাদি যা তা মুখে দিবার কদভ্যাস সর্বথা পরিবর্জন করিতে হইবে।

বাসস্থান ও কার্যস্থল

বাসস্থান ও কার্যস্থলে যাহাতে সর্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হয় এবং যথাসম্ভব রৌদ্র লাগিতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একটি ছোট ঘরে একসঙ্গে অনেক লোকের ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বাস করা বা কার্য করা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টজনক। স্বাস্থ্যকর বাড়ীতে বাসের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে যক্ষ্মারোগ অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়া থাকে।

পোষাক-পরিচ্ছদ

শীত গ্রীষ্ম ঋতুভেদে উপযুক্ত পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু কোন সময়েই অতিরিক্ত পোষাক ব্যবহার করিয়া সর্বশরীর ঢাকিয়া রাখা উচিত নহে। সর্বদা বিশেষভাবে সর্বশরীর আবৃত করিয়া রাখিলে ত্বকে বায়ু ও আলোক সংঘাতের সুফল লাভে আমরা বঞ্চিত হইয়া থাকি।

অর্থনৈতিক সংকট

এ রোগ সৃজনে দারিদ্র্যদোষের বিশেষ প্রভাব আছে। দেশের অর্থনৈতিক ও বেকার সমস্যার সমাধান না হইলে এ রোগ সম্বন্ধীয়

পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি করা কঠিন। সঙ্গতিসম্পন্ন লোক অপেক্ষা দরিদ্র লোকেরই এ রোগ বেশি হইয়া থাকে, এবং ইহার যথেষ্ট সঙ্গত কারণও রহিয়াছে। অর্থ উপার্জন হইলেই লোকের ভাল বাড়ীতে বাসের, উপযুক্ত পোষাকের, পুষ্টিকর খাদ্যের ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করা সম্ভব হইতে পারে, এবং তাহাতে রোগ-প্রতিরোধক শক্তিরও উৎকর্ষ সাধন হইয়া থাকে; কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে এ সব করা অতিশয় কঠিন। অর্থের অভাবে অনেকে ইচ্ছাসত্ত্বেও জ্ঞানপাপী হইতে বাধ্য হয়।

যাহাতে লোকের আয় বৃদ্ধি হয় এবং অল্প খরচে উপযুক্তরূপ গ্রাসাচ্ছাদন ও বসবাসের এবং শিক্ষালাভের বন্দোবস্ত করা যায়, দেশে এরূপ অবস্থার আনয়ন জন্য চেষ্টা করিতে হইবে; নতুবা যক্ষ্মানিবারণী সভায় কেবল যক্ষ্মাবীজাণু ধ্বংস বিষয়ে বক্তৃতা দিলে কোন ফল লাভ হইবে না।

গলরসগ্রন্থির (Adenoids) ও টন্‌সিলের (Tonsils) বর্ধিত অবস্থার প্রতিকার

সাধারণতঃ বাল্যকালে গলরসগ্রন্থির ও টন্‌সিলের বৃদ্ধি হইয়া শ্বাসক্রিয়ার আংশিক অবরোধ জন্মিতে পারে। এ কারণে বক্ষস্থলের ও ফুসফুসের স্বাভাবিক গঠন ও পুষ্টির অন্তরায় ঘটিয়া পরিশেষে যক্ষ্মারোগ জন্মিবার সম্ভাবনা হইতে পারে। সুচিকিৎসা দ্বারা ইহা দূর করিতে হইবে।

বক্ষস্ফীতিকারক ব্যায়ামের সুফল

মুক্ত বায়ুতে নিয়মিতরূপে বক্ষস্ফীতিকারক ব্যায়াম অভ্যাস করিলে বক্ষস্থল সুগঠিত হয় এবং ফুসফুসের বায়ুধারণ শক্তি বৃদ্ধি হয়।

মুক্ত ভ্রমণোদ্যানের ব্যবস্থা

জনসাধারণের মুক্তবায়ু সেবনের সুবিধার জন্য বড় শহরে যথেষ্ট মুক্ত ভ্রমণোদ্যানের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। তাহাতে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির বিশেষ সাহায্য হইয়া থাকে।

খাবার দোকানের উন্নতি

চা, সরবৎ ও খাবার দোকানের বাটি, গ্লাস, প্লেটগুলি উপযুক্তরূপে না ধুইয়াই পুনরায় ব্যবহার করা হয়। উক্ত ব্যবহার অতিশয় গর্হিত, ইহাতে রোগ বিস্তারের সুযোগ বৃদ্ধি হয়। এই বাসনগুলি নির্ভরযোগ্য-ভাবে ধুইবার বন্দোবস্ত করা না গেলে, এ উদ্দেশ্যে মাটির বাসন ও পাতা প্রচলন করা শ্রেয়। তাহাতে এরূপে রোগ বিস্তারের সুযোগ অনেক হ্রাস পাইবে।

ধোঁয়া

ধোঁয়ার আধিক্য নানা প্রকারে অপকারী। ইহার প্রভাব যক্ষ্মারোগ বৃদ্ধির সহায়তা করে। উননের জন্য নূতন ধরণের চিম্‌নির ব্যবস্থা করিলে, অথবা উনন ধরানোর জন্য ঘুঁটের পরিবর্তে প্রথমে কাঠকয়লা দিয়া একটু ধরাইয়া পরে কোক কয়লা সংযোগ করিয়া কিছু কাল বাতাস দিলে ধোঁয়া কম হইবে।

নারীদের অবস্থার বিশেষত্ব

স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশ সময়েই ঘরে আবদ্ধ থাকে, তাহাদের মুক্ত বায়ু সেবনের সুযোগ ও সুবিধা অনেক কম। এজন্য তাহাদের যক্ষ্মারোগ

হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। অধিকন্তু গর্ভধারণ ও সন্তানপালন হেতু স্ত্রীলোকদের জীবনীশক্তির উপর বিশেষ চাপ পড়ে। তদুপরি যদি অল্প কাল ব্যবধানে বহু সন্তান হয়, তবে তাহারা প্রসবের পর অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে। এ সব কারণে প্রসবের পর তাহাদের যক্ষ্মা হইবার সম্ভাবনা অধিক হয়। এ অবস্থার প্রতিকার জন্য তাহাদিগকে মুক্ত বায়ু সেবনের অধিক সুযোগ ও সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং বিশেষ সংযতভাবে জীবন যাপন করিয়া ঘন ঘন অধিক সন্তানের জন্ম নিরোধ করা সঙ্গত হইবে।

এ রোগের **মৃত্যু-সংখ্যা ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত** পুরুষ হইতে **স্ত্রীলোকের অনেক অধিক।**

এই বয়সই নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ কাল, এই কালেই দেহের পূর্ণ বিকাশ হয়, ইহাই গর্ভধারণ ও সন্তানপালনের প্রকৃষ্ট কাল, আর এই কালেই বহুসংখ্যক রত্নপ্রসূ মাতৃগণ অকালে কালকবলে পতিত হয়। ইহা যে দেশের জনবলবৃদ্ধির বিশেষ প্রতিকূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেক সমাজ ও দেশ হিতৈষী ব্যক্তিরই বিশেষ চিন্তা করা আবশ্যক।

বীজাণু বিনাশ

রোগীর শ্লেষ্মা ও রুগ্ন গাভীর দুগ্ধ এই দুইই বীজাণুসমূহের প্রধান আধার। সুতরাং রোগবীজাণু বিনষ্ট করিতে হইলে এ উভয়ের প্রতিই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শ্লেষ্মা সম্বন্ধীয় সতর্কতা

ক্ষয়রোগীর কখনও যেখানে-সেখানে ঘরের মেঝে বা দেওয়ালে, অথবা কোন জনসাধারণের সমাগমস্থানে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করা উচিত নহে। কেবল এ রোগীর কেন, কাহারও যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা উচিত নহে। রুগ্ন নহে এমন ব্যক্তির কফের সঙ্গেও অনেক সময়ে এ রোগের বীজাণু থাকিতে পারে এবং তদ্দ্বারা অন্য লোক আক্রান্ত হইতে পারে। আর কফের সঙ্গে যক্ষ্মা ভিন্ন অন্যান্য রোগের বীজাণুও নিঃসৃত হইতে পারে। এজন্য সকলের পক্ষেই যত্রতত্র থুথু ফেলা নিষিদ্ধ। যেখানে-সেখানে থুথু ফেলা অমার্জিত রুচিরও পরিচায়ক।

হাঁচিবার ও কাসিবার সময়েও দেহনিঃসৃত আর্দ্রকণার সহিত রোগবীজাণু বহির্গত হয়, এজন্য সে সময়ে মুখের সম্মুখে এক খণ্ড কাগজের টুকরা ব্যবহার করা সঙ্গত। পরে সেই শ্লেষ্মাযুক্ত কাগজটি পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অনেকে রুমাল ব্যবহার করিয়া থাকে। রুমাল হইতে কাগজের টুকরার ব্যবহারই অধিক সুবিধাজনক।

বীজাণু ধ্বংসের উপায়

তাপপ্রয়োগ

৬০° সেন্টিগ্রেড তাপে ২০ মিনিট কাল রাখিলে যক্ষ্মাবীজাণু বিনষ্ট হয়।

সূর্যকিরণ

অনাবৃত যক্ষ্মাবীজাণু প্রত্যক্ষ (direct) সূর্যকিরণে কয়েক ঘণ্টায় বিনষ্ট হয়; কিন্তু পরোক্ষ (diffused) সূর্যকিরণে এইগুলি বিনষ্ট

হইতে কয়েক দিন লাগে। শ্লেষ্মাস্থিত বীজাণুসমূহে প্রত্যক্ষভাবে সূর্যকিরণ লাগে না; এজন্য রৌদ্রে উহারা বিনষ্ট হইতে কিছু সময় লাগে। আর্দ্র অন্ধকার স্থানে এগুলি অনেক মাস জীবিত থাকিতে পারে।

অগ্নিসংযোগ

রোগীর শ্লেষ্মা পোড়াইয়া ফেলাই বীজাণু বিনাশের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এজন্য ন্যাকড়ায় বা কাগজের টুকরায় কফ ফেলা যাইতে পারে; এই টুকরাগুলি ভাঁজ করিয়া একটি বড় কাগজের থলিতে জমাইয়া পরে পোড়াইয়া ফেলা সঙ্গত।

বীজঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ

রোগী যে কফ ফেলে তাহা যেন শুকাইয়া না যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ শুকাইয়া গেলেই তন্মধ্যস্থ বীজাণুসমূহ ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে। এই আশঙ্কা দূর করিবার উদ্দেশ্যে রোগীর কফ ফেলিবার জন্য একটি ঢাকনি-যুক্ত পাত্র ব্যবহার করা সুবিধাজনক, কিন্তু তাহা বীজঘ্ন ঔষধমিশ্রিত জলে প্রায় অর্ধপূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। কিছু কফ জমিলেই উহা নর্দমার মুখে ঢালিয়া ফেলিয়া দিবে এবং পাত্রটি বীজঘ্ন ঔষধমিশ্রিত জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। বীজঘ্ন ঔষধের অভাব হইলে বরং অর্ধ জল-পূর্ণ পাত্রে শ্লেষ্মা ফেলিবে এবং তাহা পরে বাজে কাগজ, খড়, কেরাসিন তৈল বা কাঠের গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। এজন্য নিম্নরূপে বীজঘ্ন ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ঔষধ	শতকরা পরিমাণ
কার্বলিক এসিড	৫%
ফরমেলিন (Formalin)	১০%
ব্লীচিং পাউডার (Bleaching powder)	৫%
আইজল (Izol)	½%
লাইসল (Lysol)	২%

একটি মাটির পাত্রে কিছু ছাই ও ব্লীচিং পাউডার রাখিয়া তাহাতে কফ ফেলা যাইতে পারে। পাত্রটি একটি সরা দিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত ; নতুবা মাছি, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি দ্বারা কফের অংশ অন্যত্র নীত হইলে খাদ্য ও পানীয়াদি দূষিত হইতে পারে। কফ ফেলিবার জন্য রুমাল ব্যবহার করিলে, উহা শতকরা ৫ ভাগ কার্বলিক এসিড-মিশ্রিত জলে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া বা জলে সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

রোগীর কখনও কফ গিলিয়া ফেলা উচিত নহে ; তাহাতে অন্ত্রে যক্ষ্মারোগ হইতে পারে।

থালা বাসন

রোগীর থালা বাসন ইত্যাদি অন্যের ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর এগুলি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ১৫ মিনিট ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিলে নির্দোষ হয়।

বিছানা

রোগীর বিছানা প্রভৃতি প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার কয়েক ঘণ্টার জন্য রৌদ্রে দেওয়া সঙ্গত। রোগীর বিছানা অন্যের ব্যবহার করা সঙ্গত নহে।

আসবাবপত্র

রোগীর ঘরের আসবাবপত্র বীজঘ্ন ঔষধমিশ্রিত জলে ভিজা ঝাড়ন দ্বারা মুছিয়া পরিষ্কার করিবে, এজন্য শুষ্ক ঝাড়ন ব্যবহার সুবিধাজনক নহে।

গো-দুগ্ধ সম্বন্ধীয় সতর্কতা

গোময় ও পয়োধরস্থ যক্ষ্মাক্ষত সংযোগে রুগ্ন গাভীর দুগ্ধ যক্ষ্মা-বীজাণু দ্বারা দূষিত হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ পান পরিহার করাই সঙ্গত। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা গাভীর এ রোগের অস্তিত্ব বিষয়ে সঠিক খবর জানিতে পারি না। এজন্য কোন গো-দুগ্ধই জ্বাল দিয়া তিন মিনিট কাল উত্তমরূপে না ফুটাইয়া পান করা উচিত নহে। উত্তমরূপে ফুটানো দুগ্ধ পান করিলে, এ রোগ জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না।

গাভীর যক্ষ্মারোগ থাকিলে প্রসবের পরই বৎসকে পৃথক করিয়া নীরোগ গাভীর দুগ্ধ দ্বারা উহাকে পালন করা উচিত। তাহা হইলে সে বৎসের যক্ষ্মারোগ হওয়ার আর আশঙ্কা থাকে না। এরূপভাবে জন্মমাত্র যক্ষ্মারোগাক্রান্ত গাভী হইতে বৎসগুলিকে একেবারে পৃথক

করিয়া, গোজাতি হইতে এ দুরন্ত ব্যাধি দূরীভূত করিবার চেষ্টায় বিশেষ আশাপ্রদ ফল লাভ হইয়াছে।

সুতরাং মানুষ ও গোজাতি এ উভয় ক্ষেত্রে এক নিয়মই প্রযোজ্য অর্থাৎ নবজাত শিশুকে ও বৎসকে বীজাণু-সংক্রমণ হইতে সর্বথা রক্ষা করাই যক্ষ্মাপ্রতিকারের এক প্রধান উপায়।

রোগের কথা রোগীকে বলা সঙ্গত কি না

যক্ষ্মারোগ হইয়াছে বলিয়া নির্ণীত হইলে, এ কথা রোগীকে বলা উচিত কি না, অনেক সময় এ প্রশ্ন উঠে। রোগীর আত্মীয়স্বজন অনেক সময় রোগীর নিকট এবং অপর লোকের নিকট এ কথা প্রকাশ না করিতে ডাক্তারকে অনুরোধ করিয়া থাকেন। রোগী এ কথা জানিলে ভীত ও নিরুৎসাহ হইবে এবং অপরে এ কথা জানিলে তাহারা রোগীকে একটু ঘৃণার চক্ষে দেখিবে; এই আশঙ্কাই এ রোগ গোপনের জন্য অনুরোধের মূল কারণ। কিন্তু ইহাও মনে রাখা সঙ্গত হইবে যে, এরূপ রোগের কথা গোপন করিলে, ডাক্তারের সুনাম ক্ষুণ্ণ হইবে। কারণ পরে প্রকৃত কথা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে, তখন রোগীর মনে এরূপ ধারণা হইবে যে, ডাক্তার অজ্ঞ, রোগ ধরিতে পারে নাই; অথবা ডাক্তার তাহাকে পূর্বে ফাঁকি দিয়াছে। পূর্বে যদি ডাক্তার রোগীকে প্রকৃত কথা বলিত, তবে রোগী উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া এত দিনে আরোগ্য লাভ করিতে পারিত।

এ সব ছাড়া প্রকৃত কথা বলার পক্ষে আরও গুরুতর কারণ রহিয়াছে। ইহা সংক্রামক রোগ, রোগী হইতে অন্যের, বিশেষতঃ শিশুদের, সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা অত্যন্ত অধিক। সুতরাং এ রোগের

বিষয় রোগী ও অপর সকলে সময়মত জানিলেই, ইহার প্রতিবিধান জন্য সকলেই সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে পারে। আর যত শীঘ্রই রোগের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা যায় ততই মঙ্গল, এবং এ রোগের চিকিৎসায় রোগীর সাগ্রহ সহযোগ নিতান্ত আবশ্যক। এ রোগের চিকিৎসা অর্থ-ব্যয়সাপেক্ষ, ইহার জন্যও সকলের সহযোগ ও সহানুভূতি আবশ্যক। এজন্য সুকৌশলে প্রকৃত বিষয় বলাই সঙ্গত।

চিকিৎসায় সময়ের গুরুত্ব

যক্ষ্মারোগীর আরোগ্যলাভ করা কেবল ঔষধ, বিশ্রাম, মুক্ত বায়ু সেবন, পুষ্টিকর খাদ্য ইত্যাদির উপর নির্ভর করে না, এ সম্বন্ধে **সময়**ও একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সময়ের বিষয় বিবেচনা করারও যে গুরুত্ব আছে, তাহা সাধারণতঃ লোকে ধারণা করিতে পারে না। এ রোগের আরোগ্য বিষয়ে সময়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে **তিনটি সময়ের** কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

প্রথম—**রোগ নির্ণয়ের সময়**
দ্বিতীয়—**চিকিৎসা আরম্ভের সময়**
তৃতীয়—**চিকিৎসা-ব্যাপ্তির সময়**

রোগ নির্ণয়ের সময়

এ রোগ প্রকটিত হইবার পর যত শীঘ্রই উহা ধরিতে পারা যায়, ভাবী ফল ততই শুভজনক হইবে। মনোযোগ দিয়া চেষ্টা করিলে

নানাবিধ পরীক্ষায় রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ইহা ধরা যাইতে পারে। সে সময়ে রোগ নির্ণয় করিতে পারিলে উহা আরোগ্য করা সহজসাধ্য হইবে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণীত না হইলে, ইহা দুরারোগ্য হইয়া পড়ে। এজন্য কোন্ অবস্থায় রোগ প্রথম ধরা গেল, সেই সময়ের বিশেষ গুরুত্ব আছে।

চিকিৎসা আরম্ভের সময়

যদি উপযুক্ত চিকিৎসা অবিলম্বে আরম্ভ না করা যায় তবে প্রাথমিক অবস্থায় রোগনির্ণয় করিতে পারিলেও বিশেষ কোন লাভ হইবে না। রোগের প্রথম অবস্থায় রোগী তেমন দুর্বল, অশক্ত বা শয্যাশায়ী হয় না, এজন্য অনেক সময় চিকিৎসকের পরামর্শ সত্ত্বেও উপযুক্ত চিকিৎসা আরম্ভ করিতে সে শৈথিল্য করিয়া থাকে ; এজন্যও অনেক মূল্যবান জীবন নিজদোষে অকালে নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতেই চিকিৎসা আরম্ভের সময়ের গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে।

চিকিৎসা-ব্যাপ্তির সময়

এ রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী, এজন্য ইহার চিকিৎসাও দীর্ঘকালব্যাপী হওয়া আবশ্যক। সাধারণতঃ রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবার পূর্বেই রোগী বেশ সুস্থ ও সবল বোধ করে। এজন্য অনেক সময় রোগী আর চিকিৎসাধীন থাকা অনাবশ্যক মনে করিয়া চিকিৎসা বন্ধ করিয়া থাকে। ইহার ফলে কিছুকাল পরে পুনরায় সে রোগাক্রান্ত হইয়া বিশেষ কাতর হইয়া পড়ে।

আবার কোন সময় এরূপও ঘটে যে, ছয় মাস চিকিৎসাতে কোন সুফল না পাইয়া রোগী এ চিকিৎসা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। যে ক্ষেত্রে এক বৎসর চিকিৎসার দরকার, সে ক্ষেত্রে ছয় মাস চিকিৎসায় সুফল না পাইলে নিরাশ হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এই রোগের প্রকৃতিই এইরূপ। কোন ক্ষেত্রে ছয় মাস চিকিৎসায় রোগের গতি রুদ্ধ হইতে পারে, আর কোন ক্ষেত্রে রোগের গতি রুদ্ধ হইতে দুই বৎসরও লাগিতে পারে। রোগীর পক্ষে নিজে ইহা উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়, এজন্য সুচিকিৎসকের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। এজন্য যাহার উপর বিশেষ আস্থা আছে, এরূপ একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে চলিতে হইবে। চিকিৎসার জন্য যত সময় দেওয়া আবশ্যক, সেরূপ সময় দেওয়া হয় না বলিয়া কতক রোগী আরোগ্যলাভে অযথা বঞ্চিত হয় এবং অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ইহাতেই চিকিৎসার ব্যাপ্তি-সময়ের গুরুত্ব বিষয়ে ধারণা জন্মিবে।

চিকিৎসার বন্দোবস্ত

এ রোগের সন্দেহ হইবামাত্রই পরীক্ষার ব্যবস্থার বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে, এখানে রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্তের বিষয় বলা যাইতেছে। রোগীর চিকিৎসার যে পরিমাণে সুবন্দোবস্ত করা যায় সে পরিমাণে রোগবিস্তৃতির আশঙ্কাও হ্রাস পাইয়া থাকে। কোন স্বাস্থ্যনিবাসে বা যক্ষ্মা-হাসপাতালে রোগীকে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় সকলের পক্ষে সেরূপ বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর নহে। কারণ, এ রোগের চিকিৎসার জন্য দেশে হাসপাতালে মাত্র ২৮০টি শয্যা (beds) আছে। বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর প্রায় এক লক্ষ

লোকের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু ঘটে এবং প্রায় দশ লক্ষ লোক এ রোগে নানা প্রকারে কষ্ট পায়। সুতরাং চাহিদার তুলনায় হাসপাতালে চিকিৎসার স্থানের ব্যবস্থার পরিমাণ অতিশয় নগণ্য। এ বিষয়ে জনসাধারণের চেতনা উদ্বুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যক্ষ্মা-হাসপাতালে যথেষ্ট স্থানের অভাবহেতু অধিকাংশ স্থলেই বাড়ীতে রোগীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

রোগীর জন্য একটি পৃথক ঘর ও বিছানার ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইবে। রোগীর ও পরিচর্যাকারিগণের সর্বদা স্বাস্থ্যের বিধিনিষেধ-সমূহ যত্নপূর্বক পালন করিতে হইবে। ব্যবস্থা অনুসারে ঔষধ সেবন, আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ও ব্যায়াম ইত্যাদি সকল বিষয়ের সুনির্দিষ্ট সময় ও নিয়ম থাকা সঙ্গত। এজন্য দৈনন্দিন কার্যের সময় অনুযায়ী একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে চলিতে হইবে। যাহাতে রোগী সর্বদা চিত্তের প্রফুল্লতাজনক আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিয়া আরোগ্যলাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

চিত্তের প্রফুল্লতা এবং হৃদয়ের বল ও উৎসাহ, আরোগ্যলাভের অনেক সাহায্য করিয়া থাকে।

বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যের ভাব সর্বদা পরিহার করিতে হইবে।

বিশেষভাবে আলো ও বায়ু-সঞ্চালনের সুবিধা আছে এরূপ ঘরে রোগীকে রাখিতে হইবে। যথাসম্ভব দিবারাত্র মুক্ত বায়ুতে রোগীকে রাখিতে পারিলে বিশেষ ভাল হয়। ঘরের মধ্যে অনাবশ্যক কোন আসবাবপত্র রাখা উচিত নহে। যাহাতে ঘরে কোনরূপে বিশেষ ধূলি আবর্জনা ইত্যাদি না জমিতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঘর মুছিবার জন্য ভিজা ন্যাকড়া ব্যবহার করিলে ধূলি কম হইবে।

রোগীর ঘরে শিশুদিগকে যাইতে দেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রোগী হইতে বস্তুতঃ তত বিশেষ আশঙ্কার কারণ নাই। বাল্যকালে ও কিশোর বয়সে মৃদু সংক্রমণের ফলে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুনরায় এ বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা তত নাই। কিন্তু শিশুদের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। এ রোগীর সাহচর্য তাহাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর মারাত্মক; কিন্তু পূর্ণবয়স্কদের বেলায় সেরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এ বিষয়ে জনসাধারণের মনে একটি অযথা যক্ষ্মাভীতির ভাব আছে, সে ভাবও দূর করিতে হইবে, নতুবা রোগীর চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের অন্তরায় ঘটিবে।

রোগীকে কোনরূপ অবহেলা করা উচিত নহে, তাহা হইলে আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব হইবে; রোগীরও সর্বদা এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন তাহা হইতে রোগের বীজাণুসমূহ অন্যের শরীরে প্রবেশলাভ না করিতে পারে। এ বিষয়ে উভয় পক্ষেরই জ্ঞান ও সুশিক্ষাপ্রসূত সহকারিতা থাকা একান্ত আবশ্যক।

বিশ্রাম

যক্ষ্মারোগের কোন অমোঘ ঔষধ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বিজ্ঞাপনে যে সকল ঔষধ এ রোগে অব্যর্থ বলিয়া প্রচারিত হয়, সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য নহে, এ সব কেবল দুর্বলচেতা রোগীর অর্থনাশের হেতু মাত্র। যে পর্যন্ত সেরূপ কোন ঔষধ আবিষ্কৃত না হয়, সর্ববিধ উপায়ে দেহরক্ষণকারী স্বাভাবিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতেই বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে।

এবম্বিধ কতিপয় উপায় সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা গেল।

এই সব হিতকারী উপায়মধ্যে বিশ্রামই সর্বপ্রধান। প্রতি মুহূর্তেই আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন ইত্যাদি নানাবিধ জীবনীশক্তির ক্রিয়া চলিতেছে। প্রতি ক্রিয়াতেই আমাদের শক্তি ক্ষয় হইতেছে। আমাদের কার্য যত বৃদ্ধি হয়, শক্তিরও তত অধিক প্রয়োজন হয়। সুস্থ অবস্থায় উপযুক্ত খাদ্য, বিশ্রাম ও সুনিদ্রা প্রভাবে আমাদের ক্ষয়িত শক্তির পূরণ ও নূতন শক্তির উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু যখন আমরা অসুস্থ হইয়া পড়ি, বিশেষতঃ যক্ষ্মার ন্যায় দীর্ঘকালস্থায়ী কোন ব্যারামে পীড়িত হই, তখন আর পূর্বের ন্যায় আমাদের শারীরিক ক্ষয়ের পূরণ হয় না। এ রোগের প্রকোপ যখন বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন বীজাণুজাত বিষাক্ত পদার্থসমূহ দেহে অধিক মাত্রায় সঞ্চারিত হইয়া আমাদের পরিপাক-শক্তির হানি ঘটায়, শরীর অবসন্ন ও নিস্তেজ করিয়া ফেলে, জ্বর হয় এবং ক্ষুধা মন্দীভূত হয়। এ অবস্থায় শারীরিক ক্রিয়ার যত বৃদ্ধি হয়, ততই এসব লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। কারণ শারীরিক ক্রিয়ার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রক্ত-সঞ্চালনাদি ক্রিয়ার আধিক্যহেতু রোগজাত বিষাক্ত পদার্থসমূহও অধিক পরিমাণে দেহে সঞ্চারিত হইয়া সমধিক অনিষ্ট করিয়া থাকে। এ অবস্থায় বিশ্রাম পরম উপকারী। এ অবস্থায় যাহারা বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম করে, তাহারা বেশ স্বস্তি বোধ করে, তাহাদের জ্বর হ্রাস পায়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহের ওজনও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। রোগের বৃদ্ধির সময় মুক্ত বায়ুতে বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম উপভোগ করার মত আর কোন ঔষধই এত উপকারী নহে। যত দিন পর্যন্ত দৈহিক তাপ ও নাড়ীর গতি স্বাভাবিক না হয়, তত দিন পর্যন্ত এরূপ ভাবে বিশ্রাম করা উচিত। কিন্তু কেবলমাত্র বিছানায় শুইয়া থাকিলেই বিশ্রাম লাভ হয় না। বিশ্রাম শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধই হওয়া চাই। বিছানায় শুইয়া থাকিয়া উত্তেজনা-প্রবর্তক তর্কবিতর্কে ব্যাপৃত হইলে,

গভীর দুশ্চিন্তায় কিম্বা নিবিড়ভাবে পাঠে নিমগ্ন থাকিলেও বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। ব্যাধির প্রথম অবস্থায়ই বস্তুতঃ শারীরিক ও মানসিক সম্পূর্ণ বিশ্রাম বিশেষ উপকারী। এ অবস্থায় বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম করিতে পারিলে রোগের অগ্রগতি রুদ্ধ হইবে এবং আরোগ্যলাভের পথ প্রশস্ত হইবে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় রোগী তত দুর্বল হয় না বলিয়া সে এরূপ ভাবে বিশ্রাম করিতে চায় না, এ হিতপ্রদ উপদেশ অবহেলা করে এবং ইহার ফলে তাহার আরোগ্য লাভের আশা চিরতরে ক্ষীণ হইয়া যায়। ব্যারাম যখন জটিল হইয়া পড়ে, তখন রোগী বাধ্য হইয়া শয্যাশায়ী হয় বটে, কিন্তু তখন আর বিশ্রাম হইতে তেমন সুফল লাভের আশা করা যায় না।

বিশ্রামসূচক অবস্থা—জ্বর, দুর্বল-কৃশ-হীনরক্তদেহ, শ্বাসকষ্ট, প্রতি মিনিটে নব্বইয়ের অধিক নাড়ীর দ্রুতগতি ইত্যাদি অবস্থায় বিশ্রাম সূচিত হইয়া থাকে।

বিশেষ বিশ্রামের কাল—প্রত্যেক রোগীরই মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ভোজনের পূর্বে এক ঘণ্টাকাল বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম করা আবশ্যক। আহারের পরও কিছুকাল বিশ্রাম করা সঙ্গত।

মুক্ত বায়ু সেবন

মুক্ত বায়ু সেবন যক্ষ্মারোগ চিকিৎসার একটি মূল সূত্র। বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ু প্রকৃতির একটি অমূল্য দান। ইহা আমাদের দেহরক্ষণকারী শক্তিসমূহের বিশেষ পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। ইহা ক্ষুধাহীনের ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, মন্দাগ্নির অগ্নি উত্তেজিত করে, ভুক্তদ্রব্যের আত্তীকরণের (assimilation) উন্নতি করে, নিদ্রাহীনের সুনিদ্রা আনয়ন করে,

স্ফূর্তিহীনের মনে স্ফূর্তি জন্মায়, ইহার প্রভাবে শরীরের সকল অঙ্গের ক্রিয়াগুলিই সতেজ হইয়া উঠে। সর্বদা বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ুতে বাস করিলে শৈত্যসহিষ্ণুতা জন্মে, সহজে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় দূর হয়। বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ুর এই সব হিতপ্রদ ফলসমূহ চর্মস্থ স্নায়ুর উপর সমীরণ সংঘাতের প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে। পূর্বে সকলেই ইহা বায়ুস্থ অম্লজানের ক্রিয়ার ফল বলিয়া মনে করিত। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে বলিয়া বর্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যক্ষ্মারোগীকে দিবারাত্র মুক্ত বায়ুতে রাখিলে বিশেষ উপকার হয়। যদি তাহা সম্ভবপর না হয়, তবে যে ঘরে রোগী থাকিবে, তথায় যেন বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু সর্বদা অবাধে সঞ্চরণ করিয়া তাহার দেহের উপর ক্রিয়া করিতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঘরের জানালাসমূহ দিবারাত্র খোলা রাখিতে হইবে, সঞ্চরমাণ বায়ু-প্রভাবে যে কেবল রোগীর সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ার উন্নতি সাধিত হয় তাহা নহে, সঞ্চরণ হেতু বায়ুরও বিশোধিত হইবার সুযোগ ঘটে; রোগীর দেহনিঃসৃত নানাবিধ বীজাণু ও অন্যান্য অনিষ্টকারী পদার্থ-সমূহ অসীম বায়ুরাশিতে মিশিয়া বিলীন হইয়া যায়।

শ্রম—বিশ্রামের উপকারিতা, কাল ও বিশ্রামসূচক অবস্থার বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে। ব্যারামের প্রকটিত অবস্থায় ইহার প্রাথমিক দ্রুত অগ্রগতির কালে শ্রম ও বিশ্রামের ফল পরস্পরবিপরীত—শ্রম অপকারী, বিশ্রাম উপকারী। কিন্তু যখন রোগের অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া যায়, রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে থাকে, জ্বর থাকে না, নাড়ীর গতি স্বাভাবিক হয়, তখন নিয়মিত এবং পরিমিত শ্রম ও বিশ্রাম পরস্পরের সহকারী হইয়া থাকে। শ্রমের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়াইতে হইবে। প্রথমে সকালবেলায় ভ্রমণ আরম্ভ করাই সুবিধাজনক। শ্রমে ক্লান্তি

বোধ না হওয়া চাই ; ক্লান্তি বোধ হইলেই শ্রম অতিরিক্ত হইয়াছে মনে করিতে হইবে। দীর্ঘকালস্থায়ী বিশ্রামের ফলে দেহের মাংসপেশী-সমূহ দুর্বল ও শিথিল হইয়া পড়ে, রোগের আরোগ্য লাভের সময় পরিমিত ব্যায়ামে মাংসপেশীসমূহ সবল হয়, দেহের সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু পরিশ্রম অতিরিক্ত হইলে রোগের নির্বাপিতপ্রায় অগ্নি পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া সকল আশা নির্মূল করিতে পারে। এজন্য শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক।

পরিশ্রমের পরে দেহের তাপাধিক্য হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ সুস্থ অবস্থায় প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে দেহের তাপ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরিশ্রমে নাড়ীর গতিও দ্রুত হয়, কিন্তু দুই তিন মিনিট বিশ্রামের পর সুস্থ ব্যক্তির নাড়ীর গতি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এ রোগ সক্রিয় ও গতিশীল থাকিলে দেহের তাপ ও নাড়ীর গতি এত অল্পসময় মধ্যে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। সাধারণতঃ ক্লান্তি বোধই অপরিমিত পরিশ্রমের পরিমাপক হইবে।

ইহাই কার্যতঃ সুবিধাজনক।

যক্ষ্মারোগে শরীর বিশেষ শীর্ণ হইয়া দেহের ওজন হ্রাস পায়। শরীরের এই ক্ষতি পূরণ করিয়া হৃতস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্যের আবশ্যক। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রোগের উপশম হইলেই শরীরের ওজন বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু ওজন বৃদ্ধি হইলেই সব সময়ে রোগের লাঘব হয় না। প্রত্যেক রোগীরই ব্যক্তিগত অভ্যাস, অবস্থা ও প্রয়োজন অনুরূপ খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে,

কিন্তু কেবল রোগ হিসাবেই খাদ্যনির্বাচন সব সময়ে ঠিক হইবে না। খাদ্যের প্রধান উদ্দেশ্য রোগীকে স্থূলকায় করা নহে, কিন্তু তাহাকে বলিষ্ঠ করা। পূর্বে ক্ষয়রোগে অতিরিক্ত ভোজনের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু আজকাল বিশেষজ্ঞগণ আর সেরূপ অভিমত পোষণ করেন না। অতি-ভোজন এ রোগেও অপকারী। দৈহিক কার্যকরী শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তদতিরিক্ত ভোজন করা উচিত নহে। সাধারণতঃ লোকের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ তাহার বয়স, ওজন ও কার্যের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। সচরাচর কোন নির্দিষ্ট বয়সের একজন লোকের যে পরিমাণ দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন, সে বয়সের একজন যক্ষ্মারোগীর তাহা হইতে সামান্য পরিমাণে অধিক খাদ্য হইলেই যথেষ্ট হইবে। যদি এ পরিমাণ খাদ্যে তাহার ওজন ও শক্তি আশানুরূপ বৃদ্ধি না হয়, তবে খাদ্যে কিছু অতিরিক্ত মাখন সংযোগ করা যাইতে পারে। দুগ্ধ, ডিম ও মাখন যক্ষ্মারোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী, কিন্তু এসবও অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত নহে। পূর্ণবয়স্কের পক্ষে দৈনিক প্রায় এক সের দুগ্ধ, দুইটা ডিম ও এক ছটাক মাখন অন্য সাধারণ খাদ্যের সহিত গ্রহণ করিলে বেশ যথেষ্ট হইতে পারে। এ রোগেও বিবিধ প্রকারের মিশ্রখাদ্যের ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট। ওজনের প্রতি কিলোগ্র্যামে দৈনিক চল্লিশ ক্যালোরি খাদ্যের ব্যবস্থা এ শ্রেণীর রোগীর পক্ষে যথেষ্ট হইবে। খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ ওজনের প্রতি কিলোগ্র্যামে ১·৫ গ্র্যাম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সমস্ত কার্যকরী শক্তির অন্ততঃ অর্ধেক পরিমাণ যাহাতে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য হইতে উদ্ভব হইতে পারে, এরূপ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। খাদ্যে ফ্যাট-জাতীয় বস্তুর প্রাচুর্য থাকিলে ভাল হয়, এ-জাতীয় খাদ্যের মধ্যে মাখনই সর্বোৎকৃষ্ট। যাহাতে খাদ্যে খনিজ পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণের অল্পতা না

ঘটে তজ্জন্য প্রচুর শাকসব্জি, ফল ও দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এ রোগে খাদ্যে 'সি' খাদ্যপ্রাণের প্রাচুর্য থাকা বিশেষ হিতকারী, এজন্য প্রত্যহ প্রায় এক আউন্স পরিমাণ বিলাতী বেগুন বা কমলালেবুর রস গ্রহণ করা আবশ্যক। এই সমুদয়ের অভাবে দৈনিক ১৫ মিলিগ্র্যাম অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড (Ascorbic acid) ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আহার্য যেন রুচিজনক, ক্ষুধাবর্ধক, সাদাসিধা ও লঘুপাক হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। খাদ্যনির্বাচনে রোগীর রুচি-অরুচির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সর্বদা একঘেয়ে খাদ্য রোগীর পক্ষে অরুচিকর হয়, এজন্য প্রায়ই আহার্যের পরিবর্তন করা সঙ্গত।

ওজন—সকলেই দেহের ওজনবৃদ্ধি রোগের অবস্থার উন্নতির পরিচায়ক মনে করে। এজন্য স্থূলকায় হইয়া ওজন বৃদ্ধি করিতে সকল রোগীই আগ্রহ প্রকাশ করে, ওজন বৃদ্ধি হইলে আশান্বিত হয় এবং হ্রাস হইলে নিরাশ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা সব সময়ে ঠিক নহে।

এ রোগে পুষ্টি বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু পুষ্টি ও স্থৌল্য এক কথা নহে। ওজন বৃদ্ধি হইলেই সব সময় রোগের উন্নতি হয় না, এবং কখন কখন রোগের বৃদ্ধি না হইলেও ওজন কমিতে পারে।

শীতগ্রীষ্ম ঋতুভেদে স্বভাবতঃই ওজনের বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে ওজনের কিছু হ্রাস হইয়া থাকে, ইহা রোগ-বৃদ্ধির পরিচায়ক নহে।

দেহের ওজন সারাজীবনই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় না; সময় সময় স্বভাবতঃই ওজনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু তবু এসব অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, মোটের উপর মাস মাস ওজন লওয়ার সার্থকতা আছে।

স্নান—ত্বক হইতে আমাদের কেবল স্পর্শজ্ঞান জন্মে না, ত্বকের ক্রিয়া বহুবিধ। ত্বক হইতে আমাদের বেদনা ও তাপের অনুভূতি হয়। ত্বকের মধ্য দিয়া আমাদের অভ্যন্তরে কোন ঔষধ প্রবিষ্ট হইতে পারে এবং দেহের অভ্যন্তর হইতে দূষিত পদার্থসমূহ অপসৃত হইয়া থাকে। ত্বক আমাদের দেহরক্ষণকারী বহিরাবরণ ও শারীরিক তাপের নিয়ামক। জল-বায়ু ও রৌদ্রের প্রভাব ত্বকের সংস্পর্শে প্রতিনিয়ত আমাদের জীবকোষসমূহে প্রতিফলিত হইতেছে। ত্বকের উপর জলের প্রতিক্রিয়াকেই আমরা সাধারণতঃ স্নান বলি। ইহার উপর রৌদ্রের প্রভাবকে রৌদ্রস্নান এবং বায়ুর প্রভাবকে বায়ুস্নান বলা যাইতে পারে। স্নান বিবিধ প্রকারের হইতে পারে।—

১। জলে নামিয়া অবগাহন স্নান।

২। ঝরণা-সম্পাতে স্নান।

৩। শীতল বা উষ্ণ জলে শরীর মুছিয়া ফেলাও (sponging) এক প্রকার স্নান।

বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের স্নানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সুস্থ অবস্থায় শীতল জলে অবগাহনই ভাল; ইহা বা ঝরণা-সম্পাতে স্নান যক্ষ্মারোগীর পক্ষে প্রযোজ্য নহে।

রোগের প্রকটিত অবস্থায় ঈষৎ উষ্ণজলে এবং শান্ত অবস্থায় শীতল জলে দৈনিক একবার শরীর মুছিয়া, তৎপর বেশ করিয়া গাত্রমর্দন করাই ভাল। তাহাতে রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া সতেজ হয়, সর্বশরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে এবং চর্মের ক্রিয়া ভালরূপে নিষ্পন্ন হয়।

অগ্রগতি রুদ্ধ হইলে পর রোগের শান্ত অবস্থায় সমুদ্রস্নান উপকারী, কিন্তু অন্য অবস্থায় তাহা হিতকারী নহে।

রৌদ্রস্নান—সূর্য হইতে দৃশ্য ও অদৃশ্য রশ্মিরাশি সর্বদাই জগতে

বিকীর্ণ হইতেছে। আমাদের প্রতিদিন কতক সময় অনাবৃত দেহে রৌদ্র উপভোগ করা সঙ্গত, তাহাতে সূর্যকিরণ প্রভাবে আমাদের দেহে 'ডি' খাদ্যপ্রাণের উদ্ভব হইয়া স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি ঘটে।

গ্রন্থি, অস্থি ও সন্ধিস্থলের যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত স্থানে রৌদ্রের প্রয়োগ উপকারী। কিন্তু ক্ষয়রোগে (Pulmonary Tuberculosis) এরূপে রৌদ্র উপভোগ হিতকারী নহে, বাহিরে থাকিবার সময়েও অনাবৃত দেহে সাক্ষাৎভাবে রৌদ্র লাগিতে দেওয়া সঙ্গত নহে, গ্রীষ্মকালে এরূপ করা নিতান্ত অনিষ্টজনক।

বায়ুস্নান—ইহা প্রায় সকল যক্ষ্মারোগীর পক্ষেই হিতকারী। ইহা জ্বরে বিজ্বরে সকল অবস্থায়ই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহার উপরই যক্ষ্মার মুক্তবায়ু-সেবন-চিকিৎসা নির্ভর করে। ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

পরিচ্ছদ—পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ত্বকের উপর বায়ু সংস্পর্শের ফলেই মুক্ত বায়ু সেবনের উপকারিতা লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং এ বিষয়ে রোগীর পরিচ্ছদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। সর্বদা বেশি ভারি পরিচ্ছদে সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া রাখিলে ত্বকে বায়ুর সংস্পর্শের বিঘ্ন ঘটিবে, এবং তাহা হইলে ঘরের জানালা খোলা রাখিলেও মুক্তবায়ু সেবনের সম্পূর্ণ উপকারিতা লাভে রোগী বঞ্চিত হইবে। সুতরাং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন সঞ্চরমাণ বায়ু দেহের সংস্পর্শে যথাসম্ভব আসিতে পারে এবং রোগীরও কোনরূপ অনারাম না হয়। যত কম পরিচ্ছদে রোগী আরাম বোধ করে, তাহার অধিক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা অসঙ্গত হইবে। সাধারণতঃ ঠাণ্ডা লাগিবার অযথা ভয়ে অনেক অতিরিক্ত পরিচ্ছদ ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহাতে ত্বকের প্রতিক্রিয়া-শক্তির

লাঘব হইয়া থাকে। রোগী অতিরিক্ত পরিচ্ছদ ব্যবহারে অভ্যস্ত থাকিলে, ক্রমে ক্রমে এ অভ্যাস দূর করিতে হইবে।

পশমী বস্ত্র উষ্ণতার মৃদু পরিবাহী, ভিজা অনুভূত না হইয়াও ইহা কতক জল শোষণ করিতে পারে। এজন্য বাহিরের পোষাকের নীচে চর্মসংলগ্ন পরিচ্ছদের জন্য পশমী বস্ত্রের ব্যবহার আরামপ্রদ। প্রথমে ইহা একটু রুক্ষ বোধ হইতে পারে, কিন্তু কিছুকাল ব্যবহারের পর উহার রুক্ষতা থাকে না।

রক্তপাত—কফের সঙ্গে রক্ত নিঃসৃত হইতে দেখিলে সাধারণতঃ রোগী ও তাহার আত্মীয়বন্ধুগণ অতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হয় এবং এই লক্ষণটিকে রোগের বিশেষ কঠোরতার পরিচায়ক মনে করিয়া অত্যন্ত বিষন্ন ও হতাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহাকে সাধারণতঃ সেরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। ইহা যক্ষ্মারোগের একটি আকস্মিক লক্ষণ মাত্র। কফের সঙ্গে রক্তপাত এ রোগের তরুণ বা পুরাতন অবস্থায়, সামান্য বা সাংঘাতিক অবস্থায়ও হইতে পারে; এ লক্ষণ বিকশিত না হইলেও মৃত্যু হইতে পারে; এ লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও রোগী বাঁচিতে পারে এবং অধিকাংশ স্থলে বাঁচিয়াই থাকে। সাধারণতঃ এ লক্ষণ মৃত্যু সূচনা করে না। কদাচিৎ রক্তপাতে যক্ষ্মারোগীর মৃত্যু ঘটে। এ লক্ষণের বিকাশ রোগের গুরুত্ব বা ইহার অভাব রোগের লঘুত্ব সূচনা করে না। ফুসফুসের যক্ষ্মাক্রান্ত অংশে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চয় ঘটিলে, বা তথায় কোন রক্তবাহ (blood vessel) ছিন্ন হইলে এ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। রক্তপাত প্রায়ই বিশেষ অধিক পরিমাণে হয় না এবং স্বভাবতঃই বন্ধ হইয়া যায়। রক্তপাত হইলেই চিকিৎসককে ডাকা সঙ্গত হইবে। চিকিৎসক আসা পর্যন্ত যাহাতে রক্তপাত বৃদ্ধি না হইয়া স্বাভাবিক উপায়ে উহা রুদ্ধ হইতে পারে, এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

রক্তপাত হইলে রোগী অবিলম্বে বিছানায় অর্ধশায়িত ভাবে স্থির হইয়া থাকিবে, নড়াচড়া করিলে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইয়া রক্তপাত বৃদ্ধির কারণ হইবে। এ লক্ষণ প্রকাশের পর মনের বল হারাইয়া সন্ত্রস্ত ও অস্থির হইয়া পড়িলে, হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া ও রক্তপ্রেষ (blood pressure) বৃদ্ধি হইয়া রক্তপাত বৃদ্ধি করিবে; এজন্য এ অবস্থায় সুস্থির মনে শুইয়া থাকাই কর্তব্য, রক্তপাত স্বভাবতঃই বন্ধ হইতে পারে। এসব উপায় রোগী নিজেই অবলম্বন করিতে পারে, তজ্জন্য অন্যের উপর নির্ভর করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। এ সময়ে কাসি যথাসম্ভব সংযত রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। এক চা-চামচ লবণ ৫।৬ আউন্স শীতল জলে মিশাইয়া পান করিলে বা মুখে বরফের টুকরা রাখিলে এ অবস্থায় উপকার হইতে পারে।

দৈহিক তাপ

আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপ ৯৮'৪ ফ্যা.। দেহের তাপ বৃদ্ধিই জ্বরের একটি প্রধান লক্ষণ। বীজাণুজ বিষের প্রভাবে যক্ষ্মারোগে দেহের তাপ বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ বিকালেই এ রোগে দেহের অবসাদ ও তাপ বৃদ্ধি হয়। এ রোগে সাধারণতঃ দিনে চারিবার—প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরের পরে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে শুইবার সময় দেহের তাপ দেখা সঙ্গত। এজন্য বগলে, মুখে বা মলদ্বারে তাপমান-যন্ত্র (Thermometer) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মলদ্বারে তাপমান-যন্ত্র প্রয়োগই তাপ নিরূপণের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। সাধারণতঃ বগলে বা মুখেই উহা প্রয়োগ করা হয়। বগল হইতে মুখে তাপমান-যন্ত্র প্রয়োগে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য ফল পাওয়া যায়, এজন্য উহা মুখে প্রয়োগ করাই শ্রেয়। শীতল বা উষ্ণ

পানীয় ব্যবহারের অব্যবহিত পরে মুখে তাপমান-যন্ত্র প্রয়োগ করা সঙ্গত নহে, কারণ তাহাতে প্রকৃত তাপ নিরূপণে অন্তরায় ঘটে।

ব্যবহারের সময় তাপমান-যন্ত্রের পারদাধারটি (bulb) জিহ্বার নীচে রাখিয়া রোগীর মুখ ৩ হইতে ৫ মিনিট কাল বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

ব্যবহারের পর তাপমান-যন্ত্রটি শীতল জলে ধুইয়া শীতল বীজঘ্ন ঔষধ মিশ্রিত জলে রাখিয়া দিবে। এজন্য ২½% কার্বলিক অ্যাসিড মিশ্রিত জল ব্যবহার করা যাইতে পারে। একটি কাচপাত্রের নীচে তুলা রাখিয়া তাহাতে উক্ত ঔষধমিশ্রিত জল ঢালিয়া তাপমান-যন্ত্রটি তন্মধ্যে রাখা সঙ্গত।

নাড়ীর গতি

প্রাপ্তবয়স্কের নাড়ীর গতি সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে প্রায় ৭২। যক্ষ্মারোগে নাড়ীর গতি দ্রুত হয়, ইহাও বীজাণুজ বিষের প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। দেহের তাপের অনুপাতে যক্ষ্মারোগীর নাড়ীর গতি বেশি হয়। জ্বরের বিরামকালেও নাড়ীর গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত থাকে। দেহের স্বাভাবিক তাপে নাড়ীর গতি অস্বাভাবিকরূপে দ্রুত হইলে (প্রতি মিনিটে ৯০এর অধিক হইলে) যক্ষ্মারোগের অস্তিত্ব সন্দেহ করা যাইতে পারে।

চার্টের প্রয়োজনীয়তা

একটি চার্টে (chart) দৈহিক তাপ ও নাড়ীর গতি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে লিখিয়া রাখিলে চিকিৎসা-পরিচালনা কার্যে বিশেষ সুবিধা

হয়। উহাতে দেহের ওজন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ও লিখিয়া রাখা যাইতে পারে। এইরূপে একটি চার্ট ভালরূপে তৈয়ার করিয়া রাখিলে রোগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় দৃষ্টিমাত্রই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

জলবায়ুর প্রভাব

নিজের বাড়িতে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেও অধিকাংশ যক্ষ্মারোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। প্রাথমিক, তরুণ, পুরাতন, উগ্র, কঠোর, জটিল, গুরুতর, আশাহীন এরূপ ভাবে রোগের অবস্থার অনেক শ্রেণী বিভাগ করা যায়। ভাবী ফল রোগের বর্তমান অবস্থার উপর নির্ভর করে। সকল রোগীই ভাল হইবে এরূপ আশা করা যায় না। অবস্থা দৃষ্টে যে রোগীর ভাবী ফল আশাপ্রদ নহে, তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত অন্যত্র উৎকৃষ্ট স্থানে করিলেও শেষফল শুভ হইবার আশা করা যায় না, এবং যাহার ভাবী ফল আশাপ্রদ, তাহার উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত নিজের বাড়ীতে করিলেও সে ভাল না হইবার কোন কারণ নাই।

যক্ষ্মারোগ ভাল হইয়া গেলেও পুরাতন যক্ষ্মারোগের চিহ্ন ফুসফুসে থাকিয়া যায়। পরে অন্য রোগে মৃত্যু হইলেও শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষায় সেই পুরাতন যক্ষ্মারোগের চিহ্ন ফুসফুসে পাওয়া যায়। যে সকল যক্ষ্মারোগী চিকিৎসার জন্য কখনও অন্যত্র যায় নাই, সকল দেশেই এরূপ লোকের ফুসফুসেও পুরাতন যক্ষ্মারোগের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, সকল দেশেই যক্ষ্মারোগ ভাল হয়।

এত অনুসন্ধানের পরও পৃথিবীতে এমন একটি স্থান মিলে নাই, যেখানে বাস করিলেই লোকের এ রোগ সারিয়া যাইবে; বরং ইহাই

প্রমাণিত হইয়াছে যে, সব স্থানেই যক্ষ্মারোগ ভাল হইতে পারে। তথাপি স্থানবিশেষের জলবায়ুর কতক উপকারিতা আছে। কিন্তু তাহা সর্বক্ষেত্রেই যক্ষ্মার আরামের জন্য অত্যাবশ্যক নহে।

স্থান পরিবর্তন

যদিও সকল দেশেই যক্ষ্মারোগ ভাল হয় বটে, তথাপি স্থান পরিবর্তনের গুণে যে এ রোগের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কোন এক স্থানে চিকিৎসায় উপকার না হইলে, স্থান পরিবর্তন করিলে সুফল লাভের আশা করা যাইতে পারে।

স্থান পরিবর্তন করিয়া অন্যত্র স্বাস্থ্য-নিবাসে থাকিয়া চিকিৎসা করানো বহু ব্যয়সাপেক্ষ। অনেক রোগীর অবস্থাই এত ব্যয় বহনের মত সচ্ছল নহে। অন্যত্র গিয়া স্বাস্থ্য-নিবাসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পূর্বে রোগীর আর্থিক অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অসমর্থের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত হইবে না।

স্থান পরিবর্তনের সুফল ও তাহার কারণ

অনেক সময় এরূপ দেখা গিয়াছে যে, একজন রোগীকে সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট ভাবে এক গৃহে রাখিয়া চিকিৎসায় কোন সুফল দেখা যায় নাই, কিন্তু স্থান পরিবর্তন করার পরে তাহার অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্তনের জন্য নির্বাচিত স্থান সমুদ্রের উপকূল, সমুদ্র হইতে দূরবর্তী দেশমধ্যস্থ প্রদেশ, বা পার্বত্য প্রদেশ—যেরূপ স্থানই হউক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই শুভ ফল লাভ হইয়াছে। এক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তনের

সুফল সম্পূর্ণরূপে নির্বাচিত স্থানের জলবায়ুর গুণে হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। রোগীর মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়ার উপর এই নূতন আবেষ্টনের প্রভাবই উক্ত সুফলের মুখ্য কারণ। পরিবেষ্টনের পরিবর্তনে দেহের অভ্যন্তরস্থ সুপ্ত জীবনীশক্তি বিশেষ-ভাবে উদ্দীপিত হইয়া থাকে।

কোন রোগী অর্থাভাবে তাহার অভীষ্ট স্বাস্থ্য-নিবাসে যাইতে অসমর্থ হইলে সে নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনা ও নিরাশ হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় দেখা যায় যে, বাড়ীতে ভাল চিকিৎসায়ও তাহার কোন সুফল লাভ হয় না। কিন্তু পরে যখন তাহাকে তাহার ঈপ্সিত স্থানে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা যায়, তখন তথায় অল্প সময় মধ্যেই তাহার অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে।

অনেক সময় এরূপও দেখা যায় যে, বাড়ীতে সকল রকমে ভাল চিকিৎসার বন্দোবস্ত থাকিলেও রোগীর অবস্থার উন্নতি হয় না। কিন্তু স্থানান্তরে নিজ গৃহ অপেক্ষা নানা প্রকারে অপকৃষ্টতর পরিবেষ্টন মধ্যেও তাহার অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়া থাকে।

আবার এরূপও অনেক সময় দেখা যায় যে, কেহ বিদেশে গিয়া এ রোগে আক্রান্ত হইলে, তথায় চিকিৎসার ভাল বন্দোবস্ত থাকিলেও, সেখানে তাহার উন্নতি হয় না, কিন্তু বাড়ীতে তাহার চিকিৎসার সেরূপ ভাল বন্দোবস্ত না থাকিলেও, তথায় আপন আত্মীয়স্বজন মধ্যে আসিলে সে শীঘ্রই ভাল হইয়া উঠে।

ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, স্থানবিশেষের কেবল জলবায়ুর প্রভাব অপেক্ষা সেই স্থানের ও তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার নূতনত্বের প্রভাবই স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে অধিকতর সুফলপ্রসূ।

পরিবর্তনের জন্য স্থান নির্বাচন

রোগের প্রাথমিক জটিলতাহীন অবস্থায় রোগীকে বাড়ী হইতে অন্যত্র স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠানো আবশ্যক হইলে, তাহাকে পার্বত্য প্রদেশ, সমুদ্রের উপকূল, বা সমুদ্র হইতে দূরবর্তী দেশমধ্যস্থ প্রদেশ, এসবের যে কোন স্থানের স্বাস্থ্য-নিবাসে পাঠানো যাউক না কেন, ফল শুভই হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জলবায়ুরও বিভিন্নতা আছে, এবং সকল দেশেই স্বাস্থ্য-নিবাস আছে, সকল স্বাস্থ্য-নিবাসেই এ রোগ ভাল হইতেছে। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে, স্থানীয় জলবায়ুর গুণ হইতে স্থানের ও আবেষ্টনের নূতনত্বের অনুকূল প্রভাবই অধিক প্রবল।

স্থান নির্বাচন

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে এমন কোন স্থানের অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই, যেখানে বাস করিলেই যক্ষ্মারোগ দূর হইবে। তবু রোগের অবস্থাভেদে স্থানবিশেষে বাসের উপকারিতা আছে।

যক্ষ্মারোগীর জলবায়ু পরিবর্তন জন্য স্থান নির্বাচনে নিম্নোক্ত বিষয়-গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।—

১। সে স্থানে সর্বদা অবাধে যথেষ্ট বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের সুবিধা থাকা চাই।

২। সে স্থানে বায়ুমণ্ডলের তাপের সহসা ঘোর পরিবর্তনের সম্ভাবনা না থাকা চাই।

৩। সে স্থানে যথেষ্ট রৌদ্র থাকা চাই।

এরূপ অবস্থার সমাবেশ সমুদ্র-উপকূলে, সমুদ্র হইতে দূরবর্তী দেশ-মধ্যস্থ স্থানে, বা পার্বত্য প্রদেশেও হইতে পারে।

রোগের প্রথম অবস্থায় যুবক ও মধ্যবয়সের রোগীর পক্ষে উচ্চ পার্বতীয় প্রদেশে বাস হিতকারী। বৃদ্ধ বয়সে, বা হৃদ্‌রোগ বা জ্বর আছে এরূপ অবস্থায় রোগীর পক্ষে উচ্চ পার্বতীয় প্রদেশে বাস হিতকারী নহে।

অল্পবয়স্ক ক্ষীণকায় খিটখিটে মেজাজ, বিশেষতঃ যাহাদের কাসের প্রকোপ আছে, এরূপ যক্ষ্মারোগীর পক্ষে সমুদ্র-উপকূলে বাস হিতকারী।

কফের সঙ্গে রক্ত নির্গত হয় এবং জ্বর আছে এরূপ রোগীর পক্ষে সমুদ্র হইতে দূরবর্তী দেশমধ্যস্থ সমতল স্থানে বাসই শ্রেয়।

সমুদ্র-যাত্রার ফল যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অনুকূল নহে।

রোগীর কোন্ স্থানে বাস করা উচিত, তাহা অপেক্ষা রোগীর কি ভাবে দৈনন্দিন জীবন যাপন করা উচিত, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। এ সম্বন্ধে সর্বদাই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে চলা সঙ্গত। রোগী যে স্থানেই বাস করুক, সকল স্থানেই তাহাকে সংযত ভাবে স্বাস্থ্যনীতির নিয়মাদি পালন করিতে হইবে; এসব লঙ্ঘন করিলে কোন স্থানে বাসই তাহার পক্ষে সুফলপ্রদ হইবে না।

ধূমপান

তামাক, চুরুট, সিগারেট ইত্যাদির ব্যবহার ফুসফুসীয় যক্ষ্মার বৃদ্ধি-কারক না হইলেও অন্যরূপে অপকারক, এজন্য এসবের ব্যবহার না করাই সঙ্গত। তবে যাহারা পূর্বাভ্যাসবশতঃ এসব ছাড়িতে অক্ষম,

তাহারা অতি পরিমিত মাত্রায় খোলা স্থানে বসিয়া ধূমপান করিতে পারে। যেন তামাকের ধূম নিশ্বাসের সহিত শ্বাসপথে না যাইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বাগ্‌যন্ত্রের যক্ষ্মা হইলে এই সবের ব্যবহার নিতান্ত অনিষ্টজনক। দোক্তার ব্যবহার সব সময়ই অপকারী, ইহা সর্বথা পরিত্যাজ্য।

আমাদের দেশের একই হুঁকাতে বহু লোকের তামাক খাওয়ার প্রথা এ রোগের বীজাণু-সংক্রমণের বিশেষ অনুকূল, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

দাঁতের যত্ন

প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে শুইবার পূর্বে দাঁত পরিষ্কার করা ও ভালরূপে মুখ ধৌত করা সঙ্গত। আহারের পূর্বে ও পরে উত্তমরূপে মুখ ধৌত করিতে হইবে।

রোগ নিবৃত্তির পর হৃতস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের উপায়

চিকিৎসার ফলে যখন জ্বরের বিরাম হয়, নাড়ীর গতি স্বাভাবিক হয়, কাসি থাকে না, শ্লেষ্মা হইতে বীজাণু তিরোহিত হয়, সাধারণ পরিশ্রমে কোন ক্লান্তি বোধ হয় না, তখন রোগ শান্ত বা নিবৃত্ত হইয়াছে বলা যায়। এই অবস্থাকে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের অবস্থা বলা যায় না। চিন্তা ভাবনা, অনাহার, অনিদ্রা, অতিরিক্ত শ্রম, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস প্রভৃতি কার্যে স্বাস্থের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে বা সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইলে শান্ত রোগ প্রকুপিত হইয়া পুনরায় প্রকটিত হইতে পারে।

এজন্য রোগ নিবৃত্ত হওয়া মাত্রই পুনরায় অস্বাস্থ্যকর আবেষ্টন মধ্যে বাস করা বা কার্য আরম্ভ করা সমীচীন নহে। রোগ নিবৃত্ত হইলেও পুনরায় হৃতস্বাস্থ্যের উদ্ধার করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিতে কয়েক মাস বিশেষ সাবধানে ও সুনিয়মে চলা আবশ্যক। এই সময়ে নিজের পূর্ব কাজ ক্রমশঃ পুনরায় আরম্ভ করিতে হইবে, সেই কাজ বর্তমান স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী না হইলে জীবিকার জন্য অন্য কোন নূতন সুবিধাজনক কাজ শিক্ষা করিতে হইবে। এ অবস্থায় একবারে বিনা কাজে অলস ভাবে বসিয়া থাকাও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে।

এসব লোকের পক্ষে সামান্য কাঠের কাজ, বেতের কাজ, বাগানের কাজ, কেরানির কাজ ইত্যাদি সুবিধাজনক হইতে পারে।

এই প্রকারের নিবৃত্তরোগ ব্যক্তিদের বসবাসের সুবিধার জন্য ইংলণ্ডে পেপওয়ার্থ নামক স্থানে একটি 'কলোনি' (colony) স্থাপন করা হইয়াছে, ইহাতে এই শ্রেণীর লোকের বসবাস ও জীবিকানির্বাহের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

আত্মীয়-বন্ধুর কর্তব্য

বিপদেই বন্ধুর পরীক্ষা হইয়া থাকে। রোগী তো এক দারুণ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছে। তাহার সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসার জন্য আত্মীয়-বন্ধুগণের পক্ষে বহু ত্যাগ, সংযম ও অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইবে। তাহাদের আত্মত্যাগের পরিমাণই তাহাদের প্রকৃত বন্ধুতার নিদর্শন হইবে।

রোগী একে তো এমন কঠিন রোগে অনেক যাতনা ভুগিতেছে; এ অবস্থায় সে যদি তাহাকে আত্মীয়স্বজন দ্বারা পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত

বলিয়া মনে করে, তবে সে নৈরাশ্যে ম্রিয়মান হইয়া পড়িবে এবং অপর পক্ষে আত্মীয়স্বজনকে তাহার জন্য ভাবনায় অস্থির হইতে দেখিলেও তাহার মন বিষাদে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িবে। আত্মীয়স্বজনের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা দ্বারা এ বিপদে তাহার কষ্টের লাঘব করিতে হইবে। রোগীকে সর্বদা প্রফুল্ল ও আশান্বিত রাখিতে হইবে। সাংসারিক শত কষ্ট, অসুবিধা ও মনের শত আবেগ অসীম সহিষ্ণুতার সহিত সংবরণ করিয়া আরোগ্যলাভের সাহায্যার্থে তাহার মনে সর্বদা স্ফূর্তির ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। আরোগ্যলাভের আশাবাণী শুনাইয়া তাহার হৃদয়ের বল বৃদ্ধি করিতে হইবে। এ কার্য অতি নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজন ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় না। রোগীকে মুক্ত বায়ুতে রাখার ও তাহার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের বন্দোবস্ত করা অর্থ থাকিলে অতি সহজ; কিন্তু রোগীর মন সর্বদা প্রফুল্ল রাখা, তাহার মনে উৎসাহ সঞ্চার করা কেবল অর্থের কাজ নহে—ইহা আন্তরিক অনুরাগের কাজ।

সমাজের কর্তব্য

প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের হিতের জন্য কাজ করে, কিন্তু সমাজকে দেশের ও দশের হিতের জন্য কাজ করিতে হইবে। সকলের হিত না হইলে ব্যক্তিগত হিতও সাধিত হয় না। ব্যক্তির ও সমষ্টির স্বার্থ পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

যে সকল দুঃস্থ লোক এরূপ দুরন্ত রোগে অসহায় অবস্থায় ভুগিতেছে, সমাজ কখনও তাহাদিগকে ফেলিয়া দিতে পারে না। সম্ভবতঃ সামাজিক

ব্যবস্থার কোথাও কোন ত্রুটির ফলে এসব লোক এরূপ বিপদে পতিত হইয়াছে। তাহাদের ভার এখন সমাজকে বহন করিতে হইবে। তাহাদের জন্য অন্নজল সংস্থানের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা সমাজকেই করিতে হইবে এবং যাহাতে আর কেহ ভবিষ্যতে এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়া সমাজের গলগ্রহ না হয়, তজ্জন্যও চেষ্টা করিতে হইবে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ রোগের উৎপত্তির ও বিস্তৃতির কারণসমূহ নির্ণয় করিয়াছেন এবং উহার নিবৃত্তির পথও প্রদর্শন করিয়াছেন, এখন সমাজের কর্তব্য সেই প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনপূর্বক এ দারুণ রোগের হাত হইতে সকলকে রক্ষা করা। ইহাতে স্বাস্থ্য-সমাজ-শিক্ষা-অর্থ ইত্যাদি নানা বিষয়ক নীতিবিদগণের সহানুভূতি ও সহকারিতা চাই; এবং তৎপর সকলের সমবেতভাবে উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। অদম্য অধ্যবসায় ভিন্ন এরূপ মহৎ কার্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

দেশের নানা স্থানে যক্ষ্মাসমিতি এবং যক্ষ্মারোগীর উপযোগী হাসপাতাল, স্বাস্থ্যনিবাস ইত্যাদি স্থাপন করা আবশ্যক। ইউরোপ ও আমেরিকায় এ উদ্দেশ্যে বহু প্রতিষ্ঠান আছে। ইহাতে সে সব দেশে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ বহুপরিমাণে উপশমিত হইয়াছে ও হইতেছে।

আমাদের দেশের মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক বোর্ড সমূহ এ কার্যে যক্ষ্মা-সমিতিগুলির যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। এ সব কার্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহকারিতা লাভের জন্য এ রোগ সম্বন্ধীয় পুস্তিকা জনসাধারণের মধ্যে বহুলপ্রচার করা আবশ্যক।

রকফেলারের মত এত ধনী আমাদের দেশে নাই বটে, কিন্তু তবু যে সব উদারচেতা ধনবান লোক আছেন, তাঁহারা যদি এ সব

জনহিতকর কার্যে একটু মুক্তহস্তে দান করেন, তবে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য হইতে পারে।

রোগীর কর্তব্য

আধুনিক বিজ্ঞান যক্ষ্মা সম্বন্ধে অভয়বাণী প্রচার করিয়াছে। এ রোগে আরোগ্য লাভ এখন সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে। রোগমুক্তির দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া যদি রোগী আশাপূর্ণ হৃদয়ে চিকিৎসকের উপদেশ পালন করে, তবে আরোগ্য লাভ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। কঠোর সাধনা ব্যতীত কঠিন রোগ হইতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নহে। আরোগ্য লাভের জন্য রোগীকে তাহার দৈনন্দিন জীবনের অনেক সুখ সম্ভোগ ত্যাগ করিয়া বিশেষ সংযত ভাবে জীবন যাপন অভ্যাস করিতে হইবে। তাহার আহার বিহার ও বিশ্রাম, মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই বন্ধু প্রভৃতির সহিত ব্যবহার, পড়াশোনা, ক্রীড়া-কৌতুক থিয়েটার-বায়স্কোপ-দর্শন ইত্যাদি সকল বিষয়েই সে আর পূবের ন্যায় সুস্থ ব্যক্তির মত চলিতে পারিবে না। রোগমুক্তির আশা ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য সকল প্রকারের ত্যাগই তাহাকে প্রফুল্লচিত্তে স্বীকার করিতে হইবে। অনিষ্টজনক অভ্যাস ও আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম ও চিকিৎসকের উপদেশ পালন করা কঠিন কাজ; রোগ-মুক্তির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে এই সব কাজ অকুণ্ঠিতচিত্তে সম্পাদন করা সহজ নহে। এজন্য আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে দৃঢ় ইচ্ছা ও আশা থাকা একান্ত আবশ্যক।

আর একটি বিষয়ে রোগীর বিশেষ অবহিত হওয়া সঙ্গত হইবে। সে ভুক্তভোগী, সুতরাং সে জানে যে সে একটি কিরূপ ভীষণ দুঃখদায়ক

ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ অন্য কোনও যক্ষ্মারোগীর অসাবধানতাহেতু সে আজ এ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, এত কষ্ট পাইতেছে। সে যেন আবার নিজে তাহার আত্মীয়স্বজন বা অন্য কাহারও মধ্যে এ দুরন্ত রোগ বিস্তারের কারণ না হয়, তৎপ্রতি তাহার বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অন্যের হিত করিতে সমর্থ না হইলেও, অন্ততঃ অন্যের অহিত সাধনে বিরত হইতে হইবে। তাহা হইলেই মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষিত হইবে।

বিবাহ

যক্ষ্মারোগীর বিবাহ করা উচিত কি না? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক।

১। রোগী হইতে সুস্থ জীবনসঙ্গীর রোগ সঞ্চারের আশঙ্কা।

যক্ষ্মারোগী হইতে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুনরায় এ বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা নাই। দম্পতির মধ্যে এক জনের ক্ষয়রোগ থাকিলে সংসর্গদোষে অন্য জনের এ রোগ হইতে বড় দেখা যায় না। বাল্যকালে মৃদু সংক্রমণের ফলে অনাক্রম্যতা অর্জনই এরূপ নিষ্কৃতি লাভের মুখ্য কারণ। যদি সুস্থ সঙ্গীর উক্তরূপে অনাক্রম্যতা না জন্মিয়া থাকে, তবে এরূপ সংসর্গে তাহার বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থায় প্রথমেই প্রচুর পরিমাণ বীজাণুর সম্মুখে আপতিত হইতে হইবে। ইহার ফলে তাহার উগ্রধরণের যক্ষ্মা হওয়ার সম্ভবনাই অধিক থাকিবে। সুস্থ সঙ্গীর বাল্যকালে সংক্রমণ ঘটিয়াছে কি না, তাহা সূচি প্রয়োগ টিউবার্‌কিউলিন ব্যবহার করিলে অনায়াসেই বুঝা যাইবে। যাহার বাল্যকালে মৃদু সংক্রমণজনিত অনাক্রম্যতা অর্জিত হয় নাই, তাহার পক্ষে রোগীর সহিত এরূপ বসবাস

করা যে বিপজ্জনক হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অন্য জনের এরূপে অর্জিত অনাক্রম্যতা থাকিলেও এরূপ অবস্থায় উভয় পক্ষেরই রোগ নিবারণ কল্পে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

২। রোগী হইতে ভাবী সন্তানের রোগ সঞ্চারের আশঙ্কা।

শিশু এই দুরন্ত ব্যাধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। মাতাপিতার এ রোগ থাকিলেও সুস্থ সন্তান জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় সন্তানের এ রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া সুকঠিন। জন্মমাত্র তাহাকে স্থানান্তরিত করা ভিন্ন নবজাত শিশুর এ রোগের হাত হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই।

৩। বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব ও প্রভাব।

বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব গুরুতর এবং তাহাতে মানুষের দৈহিক, মানসিক, আর্থিক প্রভৃতি সর্ববিধ শক্তির উপরই চাহিদা অতিশয় বৃদ্ধি হয়। বিশেষ সংযত হইতে না পারিলে এই সব চাহিদা মিটাইতে সকল শক্তি নিঃশেষ হইয়া যায়।

বিবাহিত জীবনের ফলাফল মিতাচারী ও সংযতমনা পুরুষের পক্ষে তত অহিতকর না হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ সেরূপ লোক অতি বিরল। গর্ভধারণ ও সন্তানের লালন পালন হেতু ভাবী মাতার পক্ষে ইহার প্রভাব বিষম অনিষ্টজনক। অন্তঃসত্ত্বা না হইলে সংযতমনা রমণীর পক্ষে উহা তত আশঙ্কাজনক নহে।

এ রোগের চিকিৎসা অর্থব্যয়সাপেক্ষ, সুতরাং চিকিৎসার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হইবে, বিবাহিত জীবনে সাংসারিক ব্যয় ও দায়িত্ব বৃদ্ধি হইবে; এবং তদুপরি রোগীর উপার্জনশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। অধিকন্তু অনেক আনুষঙ্গিক দুশ্চিন্তা স্বভাবতঃই আসিয়া উপস্থিত হইবে। যদি এক জনের মৃত্যু ঘটে, তবে অন্যের দশা ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে? যে

সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই সেখানে স্বামীর মৃত্যুর পর নিরাশ্রয় বিধবার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে। এই প্রকার নানা বিভীষিকার কথা মনে উদয় হইলে নৈরাশ্যে জীবন বিষাদময় হইয়া উঠিবে।

প্রকটিত যক্ষ্মার গতি রোধ করিতে হইলে দৈহিক, মানসিক, আর্থিক ইত্যাদি সকল প্রকারের শক্তির অন্যরূপে অপচয় ও অপব্যয় বন্ধ করিতে হইবে এবং সকল শক্তি একত্র সংগৃহীত করিয়া কেবল এই মারাত্মক ব্যাধির প্রতিকারে নিয়োজিত করিতে হইবে।

যক্ষ্মার গতিরোধ ও বিবাহিত জীবনের চাহিদার পরস্পর বিপরীত সম্বন্ধ। এক সঙ্গে এ উভয় কার্যের সন্তোষজনক সমাধান করা সম্ভবপর নহে। এজন্য যক্ষ্মার প্রকটিত অবস্থায় বিবাহিত জীবনের সুখসম্ভোগ বাসনা পরিহার করাই সদ্বিবেচনার পরিচায়ক হইবে।

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এক জন নিরাশ্রয়া রমণীর সহিত কোন বিত্তশালী পুরুষের বিবাহ হইলে, সে রমণীর পক্ষে এ বিবাহ শুভজনক হইবে। কারণ ধনী স্বামীর ভালবাসাপূর্ণ যত্নে উক্ত রমণীর সকল অভাব দূর হইবে এবং তাহার সুচিকিৎসার সহজেই বন্দোবস্ত হইবে। কোন ধনবতী রমণীর সহিত, রোগের প্রাথমিক অবস্থায় কোন দরিদ্র পুরুষের বিবাহের ফলও অনুরূপ কারণে উক্ত পুরুষের পক্ষে বিশেষ শুভজনক হইবে সন্দেহ নাই। কোন কোন বিশেষ অবস্থায় বিবাহের এরূপ শুভফল লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত মনে করিতে হইবে।

সাধারণতঃ এ রোগের গতি রুদ্ধ হওয়ার অন্ততঃ দুই বৎসর পর সুচিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া বিবাহ করা যাইতে পারে। কিন্তু রোগের প্রকটিত অবস্থায় বিবাহ করিবার সঙ্কল্প মনে স্থান দেওয়া উচিত হইবে না।

লোকশিক্ষা

জ্ঞানবল এক প্রধান বল। জ্ঞানই সমস্ত কার্যকরী শক্তির উৎস। অজ্ঞতাই দুর্বলতার প্রধান কারণ। যক্ষ্মা সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে, জনসাধারণের মধ্যে ইহা অবারিত ভাবে বহুল প্রচার করিতে হইবে। জ্ঞান-সূর্যের উদয়ে অজ্ঞান-তিমির তিরোহিত হইবে; শক্তির আবির্ভাবে দুর্বলতা দূরে পলায়ন করিবে, উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে।

ইহা নিবার্য রোগ, কারণ এ রোগের কারণ আমাদের করায়ত্ত। কারণ দূর করিতে পারিলে রোগ আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে। অন্য দেশের লোক এ সম্বন্ধে অনেক উন্নতি করিয়াছে। অন্যে যাহা করিয়াছে, তাহাতে আমাদের অপারগ হইবার কোন কারণ নাই।

সর্বাগ্রে জনসাধারণের মধ্যে এ রোগ সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিস্তৃত ভাবে প্রচার করা আবশ্যক। রুগ্ন ও সুস্থ সকল ব্যক্তিরই এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই যে, ইহা সংক্রামী ব্যাধি, কি প্রকারে এ বীজাণু রোগীর দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া অন্যের শরীরে প্রবেশ করে এবং কি উপায়ে তাহা নিবারণ করা যায়। রোগী, নীরোগ সকলেরই এ সকল বিষয় অবগত হইয়া সাবধানতা সহকারে উহার প্রতিকার কল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এ বিষয়ে সফলতা লাভের আশা করা যায় না।

রোগী যদি জানে যে, সে একটি সাংঘাতিক সংক্রামী ব্যাধিতে পীড়িত এবং যদি সে জানে কি প্রকারে রোগী হইতে এ বীজাণু অন্য লোকে সঞ্চারিত হয় এবং তাহার প্রতিকার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তবে সে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণাধিক পুত্রকন্যা ও নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজন ও পরিবারবর্গ যাহাতে তাহার সংসর্গে আসিয়া ঐ ব্যাধিগ্রস্ত না হইতে

পারে তদনুরূপ চেষ্টা করিবে, এবং পরিচর্যাকারিগণও তদনুরূপ প্রতিকারের ন্যায্য উপায় অবলম্বন করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত বিষয়ের জ্ঞান ও সুশিক্ষার অভাব থাকিলে, ইচ্ছাসত্ত্বেও লোকে প্রতিকারের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে পারে না, বরং সময়ে সময়ে অজ্ঞতা ও কুশিক্ষার দোষে হিতে বিপরীত ঘটাইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগী মাত্রই সব সময়ে অন্যের পক্ষে ভয়াবহ নহে। যে যক্ষ্মারোগী স্বাস্থ্যের নিয়মাদি বিষয়ে অজ্ঞ, অথবা এ সব জানিয়াও যথারীতি পালন করিতে অবহেলা করে, এরূপ রোগীই অন্যের পক্ষে বিপজ্জনক। কিন্তু যে রোগী এ সব নিয়মাদি জানে এবং যত্নপূর্বক পালন করে, এরূপ রোগীর সঙ্গে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিরাপদে বাস করিতে পারে।

বর্তমানে যক্ষ্মারোগীর আরোগ্যলাভ সাধ্যায়ত্ত হইয়াছে, ইহা নিতান্তই আশার বাণী এবং সকলেই ইহাতে উৎসাহিত হইবে সন্দেহ নাই।

এ সংসারে মানুষ কেবল নিজের জন্য জীবনধারণ করে না, মানুষ যতই উচ্চস্তরে আরোহণ করে, ততই নিজের জীবন অন্যের হিতের জন্য সমর্পণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। অন্যের হিত আমরা করিতে পারি আর না পারি, আমরা যেন কখনও অন্যের অহিতের কারণ না হই, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা সঙ্গত। এজন্য যক্ষ্মারোগীর সর্বদা যত্নপূর্বক স্বাস্থ্যরক্ষার নীতিসমূহ পালন করিতে হইবে, যেন তাহার দ্বারা অন্য কাহারও কোন অনিষ্ট না ঘটিতে পারে।

উপসংহার

এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে স্বতঃই আমাদের মনে হইবে যে, অর্থাভাব ও সুশিক্ষার অভাবই এ রোগ প্রতিকারের চেষ্টার প্রধান অন্তরায়। যদি জ্ঞান ও সুশিক্ষার বিস্তার হয়, তবে অর্থাভাব সত্ত্বেও আমরা এ বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে পারিব। প্রচুর অর্থ থাকাসত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই যে, সংযম ও সুশিক্ষার অভাবে অনেক ধনীলোক, বহু নিবারণযোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। শুধু টাকা থাকিলেই হয় না, জ্ঞান ও সুশিক্ষা চাই। অনেক ধনীলোকের বাসগৃহ একটি ইষ্টকনির্মিত সিন্দুক বিশেষ, তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু ও আলো প্রবেশের বিশেষ বন্দোবস্ত নাই। অনেকের বাসগৃহে যথেষ্ট দরজা জানালা আছে বটে, কিন্তু তাহা যেন শুধু শোভাবর্ধনের জন্য ; অনেক সময়েই ঠাণ্ডা লাগিবার অযথা ভয়ে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ধনীলোকের খাদ্য ও পানীয়ও অনেক সময়ে স্বাস্থ্যজনক নহে।

আমরা সকলে যদি স্বাস্থ্যবিদ্যার বিধিনিষেধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ-বিধান জন্য উৎসাহ সহকারে চেষ্টা করি, তবে যে কেবল আমরা যক্ষ্মার প্রতিকার করিতে পারিব তাহা নহে, বরং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেক প্রকারেই উন্নতিলাভ করিয়া আমরা সুস্থ সবল সতেজ দেহে ও উন্নত শিরে অন্যান্য উন্নত জাতির সমকক্ষ হইয়া জগতে বিচরণ করিতে সক্ষম হইব।

অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অলসভাবে বসিয়া থাকিলে কোন উন্নতি হইবে না। পুরুষকারের উপর নির্ভর করিয়া অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর

হইলে পর্বতপ্রমাণ বিঘ্নরাশিও বিদূরিত হইবে এবং সাফল্যের বিজয়মাল্য লাভ হইবে। স্বকার্য সাধনে নিজে পরিশ্রান্ত না হইলে দেবতার সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

'ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ'।

পরিশিষ্ট

বয়স ও উচ্চতা অনুসারে ১ হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক বালক ও বালিকাদের পাউণ্ড হিসাবে গড় ওজন

বালকদের ওজন

বয়স বৎসর	উচ্চতা ইঞ্চি হিসাবে	পাউণ্ড
১	৩০	২২
২	৩৩·৫	২৭
৩	৩৭	৩২
৪	৩৯	৩৬
৫	৪১·৫	৪১
৬	৪৪	৪৫
৭	৪৫·৫	৪৯
৮	৪৭·৫	৫৩·৫
৯	৪৯·৫	৫৯·৫
১০	৫১·৫	৬৫·৫
১১	৫৩·৫	৭১
১২	৫৫·৫	৭৮
১৩	৫৭·৫	৮৫
১৪	৬০	৯৬
১৫	৬২·৫	১০৭·৫
১৬	৬৩	১১৭

বালিকাদের ওজন

বয়স বৎসর	উচ্চতা ইঞ্চি হিসাবে	পাউণ্ড
১	২৯	২১
২	৩২·৫	২৬
৩	৩৫·৫	৩১
৪	৩৮	৩৫
৫	৪১	৪০
৬	৪৩·২৫	৪৩·২৫
৭	৪৫·২৫	৪৮
৮	৪৭·২৫	৫২·৫
৯	৪৯·২৫	৫৭·২৫
১০	৫১·২৫	৬৩
১১	৫৩·২৫	৬৯·৫
১২	৫৬·৫	৮০
১৩	৫৮·২৫	৯০
১৪	৬০	৯৯
১৫	৬১·৫	১০৭
১৬	৬১·৫	১১২·৫

বয়স ও উচ্চতা অনুসারে ১৭ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষের পাউণ্ড হিসাবে গড় ওজন

ফুট ও ইঞ্চি হিসাবে উচ্চতা

বয়স	৫′	৫′—২″	৫′—৪″	৫′—৬″	৫′—৮
১৭	১০১	১০৬	১১২	১২০	১২৮
১৮	১০৩	১০৮	১১৪	১২২	১৩০
১৯	১০৫	১১০	১১৬	১২৪	১৩২
২০	১০৭	১১২	১১৮	১২৬	১৩৪
২১	১০৮	১১৩	১২০	১২৮	১৩৫
২২	১০৯	১১৪	১২১	১২৯	১৩৬
২৩	১১০	১১৫	১২২	১৩০	১৩৭
২৪	১১১	১১৬	১২৩	১৩১	১৩৮
২৫	১১২	১১৬	১২৩	১৩১	১৩৯
২৬	১১৩	১১৭	১২৪	১৩২	১৪০
২৭	১১৪	১১৮	১২৪	১৩২	১৪০
২৮	১১৫	১১৯	১২৫	১৩৩	১৪১
২৯	১১৬	১২০	১২৬	১৩৪	১৪২
৩০	১১৬	১২০	১২৬	১৩৪	১৪২
৩১	১১৭	১২১	১২৭	১৩৫	১৪৩
৩২	১১৭	১২১	১২৭	১৩৫	১৪৪
৩৩	১১৭	১২১	১২৭	১৩৫	১৪৪

বয়স	৫′	৫′—২″	৫′—৪″	৫′—৬″	৫″—৮′
৩৪	১১৮	১২২	১২৮	১৩৬	১৪৫
৩৫	১১৮	১২২	১২৮	১৩৬	১৪৫
৩৬	১১৯	১২৩	১২৯	১৩৭	১৪৬
৩৭	১১৯	১২৩	১৩০	১৩৮	১৪৭
৩৮	১২০	১২৪	১৩০	১৩৮	১৪৭
৩৯	১২০	১২৪	১৩০	১৩৮	১৪৭
৪০	১২১	১২৫	১৩১	১৩৯	১৪৮
৪১	১২১	১২৫	১৩১	১৩৯	১৪৮
৪২	১২২	১২৬	১৩২	১৪০	১৪৯
৪৩	১২২	১২৬	১৩২	১৪০	১৪৯
৪৪	১২৩	১২৭	১৩৩	১৪১	১৫০
৪৫	১২৩	১২৭	১৩৩	১৪১	১৫০
৪৬	১২৪	১২৮	১৩৪	১৪২	১৫১
৪৭	১২৪	১২৮	১৩৪	১৪২	১৫১
৪৮	১২৪	১২৮	১৩৪	১৪২	১৫১
৪৯	১২৪	১২৮	১৩৪	১৪২	১৫১
৫০	১২৪	১২৮	১৩৪	১৪২	১৫১
৫৫	১২৫	১২৮	১৩৫	১৪৩	১৫৩

বয়স ও উচ্চতা অনুসারে ১৭ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক স্ত্রীলোকের পাউণ্ড হিসাবে গড় ওজন

বয়স	৪′—৮′	৪′—১০′	৫′	৫′—২″	৫′—৪″	৫′—৬″
১৭	৯৭	১০১	১০৫	১১০	১১৬	১২৩
১৮	৯৮	১০২	১০৬	১১১	১১৭	১২৪
১৯	৯৯	১০৩	১০৭	১১২	১১৮	১২৫
২০	১০০	১০৪	১০৮	১১৩	১১৯	১২৬
২১	১০১	১০৫	১০৯	১১৪	১২০	১২৭
২২	১০১	১০৫	১০৯	১১৪	১২০	১২৮
২৩	১০২	১০৬	১১০	১১৫	১২১	১২৮
২৪	১০৩	১০৭	১১১	১১৫	১২১	১২৮
২৫	১০৩	১০৭	১১১	১১৫	১২২	১২৯
২৬	১০৪	১০৮	১১২	১১৬	১২২	১২৯
২৭	১০৪	১০৮	১১২	১১৬	১২৩	১৩০
২৮	১০৫	১০৯	১১৩	১১৭	১২৪	১৩১
২৯	১০৫	১০৯	১১৩	১১৭	১২৪	১৩১
৩০	১০৬	১১০	১১৪	১১৮	১২৫	১৩২
৩১	১০৭	১১১	১১৫	১১৯	১২৬	১৩৩
৩২	১০৭	১১১	১১৫	১১৯	১২৬	১৩৪
৩৩	১০৮	১১২	১১৬	১২০	১২৭	১৩৪
৩৪	১০৯	১১৩	১১৭	১২১	১২৮	১৩৬
৩৫	১০৯	১১৩	১১৭	১২১	১২৮	১৩৬

বয়স	৪'—৮"	৪'—১০"	৫'	৫'—২"	৫'—৪"	৫'—৬
৩৬	১১০	১১৪	১১৮	১২২	১২৯	১৩৭
৩৭	১১০	১১৪	১১৮	১২৩	১৩০	১৩৮
৩৮	১১১	১১৫	১১৯	১২৪	১৩১	১৩৯
৩৯	১১২	১১৬	১২০	১২৫	১৩২	১৪০
৪০	১১৩	১১৭	১২১	১২৬	১৩২	১৪০
৪১	১১৪	১১৮	১২২	১২৭	১৩৩	১৪১
৪২	১১৪	১১৮	১২৩	১২৭	১৩৩	১৪১
৪৩	১১৫	১১৯	১২৩	১২৮	১৩৪	১৪২
৪৪	১১৬	১২০	১২৪	১২৯	১৩৫	১৪৩
৪৫	১১৬	১২০	১২৪	১২৯	১৩৫	১৪৩
৪৬	১১৭	১২১	১২৫	১৩০	১৩৬	১৪৪
৪৭	১১৭	১২১	১২৫	১৩০	১৩৬	১৪৫
৪৮	১১৮	১২২	১২৬	১৩১	১৩৭	১৪৬
৪৯	১১৮	১২২	১২৬	১৩১	১৩৭	১৪৬
৫০	১১৯	১২৩	১২৭	১৩২	১৩৮	১৪৬
৫৫	১১৯	১২৩	১২৭	১৩২	১৩৮	১৪৭

বয়স ও উচ্চতা অনুসারে আমাদের ভারতবাসীদের ওজনের খুব ঠিক তালিকার অভাব আছে ; এজন্য ইংরেজী পুস্তক হইতে বিদেশীয় লাকের গড় ওজনের তালিকাই এ পুস্তকে সন্নিবেশিত করা গেল। বহু সহস্র লোকের ওজন পরীক্ষা করিয়া এই সব গড় ওজনের তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা হইতে গড় ওজনের মোটামুটি ধারণা হইবে। আমাদের ওজন উপরি-উক্ত ওজন হইতে কিঞ্চিৎ কম হইবে।

আমাদের দেশে কারাগারে বহুসংখ্যক কয়েদীদের পরীক্ষার ফল হইতে একটি গড় ওজন বাহির করিবার প্রণালীও প্রচলিত আছে। তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

উচ্চতা	ওজন
৫′	১০০ পাউণ্ড
৫′ ১″	১০৩ ,,
৫′ ২″	১০৬ ,,
৫′ ৩″	১০৯ ,,
৫′ ৪″	১১২ ,,
৫′ ৫″	১১৫ ,,
৫′ ৬″	১১৮ ,,

৫ ফুট উচ্চ ব্যক্তির ওজন গড়ে ১০০ পাউণ্ড ধরা হয় এবং তৎপর প্রতি পূর্ণ এক ইঞ্চিতে ৩ পাউণ্ড ওজন যোগ করা হয়।

কলিকাতার নিকট নিম্নলিখিত স্থানে বিনা ব্যয়ে যক্ষ্মারোগ পরীক্ষার ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে।

১। চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল
২৪ নং গোরাচাঁদ রোড (ইটিলি)

২। হাবড়া জেনারেল হাসপাতাল, হাবড়া

৩। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, কলেজ স্ট্রীট

৪। ইসলামিয়া হাসপাতাল, ১নং বলাই দত্ত স্ট্রীট, কলুটোলা

৫। সার্ গুরুদাস ইন্‌স্টিটিউট, ২৯নং গুরুদাস রোড, নারিকেলডাঙ্গা

৬। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, বেলগাছিয়া

যক্ষ্মারোগীর জন্য প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্যনিবাসসমূহের তালিকা

১। পাইন্ পাহাড় স্বাস্থ্যনিবাস, আলমোড়া, যুক্তপ্রদেশ।
(Pine Hill Sanatorium, Almorah, U. P.)

২। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, ২৪ পরগণা

৩। ইউনিয়ন মিশন স্বাস্থ্যনিবাস, মদনপল্লী, দক্ষিণ ভারত।
(Union Mission Tuberculosis Sanatorium, Madanpalli, South India)

৪। কিং এডওয়ার্ড স্বাস্থ্যনিবাস, ভাওয়ালী, যুক্তপ্রদেশ।
(King Edward Sanatorium, Bhowali, U. P.)

৫। পাইন লজ, রাণীধারা, আলমোড়া, যুক্তপ্রদেশ।
(Pine Lodge, Ranidhara, Almorah, U. P.)

৬। ইণ্ডিয়ান মিশন যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস, পেণ্ড্রা রোড, মধ্যপ্রদেশ।
(Indian Mission Tuberculosis Sanatorium, Pendra Road, C. P.)

৭। দি লেডী আরউইন স্বাস্থ্যনিবাস, ভাওয়ালী, সিম্‌লা পাহাড়
(The Lady Irwin Sanatorium, Bhowali, Simla Hills)

৮। ওয়েস্‌লিয়ান মিশন হাসপাতাল, সারেঙ্গা, মেদিনীপুর।
(Weslyen Mission Hospital, Sarenga, Midnapur)

৯। ইট্‌কি স্বাস্থ্যনিবাস, ইট্‌কি, রাঁচি।
(Itki Sanatorium, Itki, Ranchi)

১০। ভিসান্তিপুরাম্ যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস, রাজামাণ্ড্রি, দক্ষিণ ভারত।
(Visantipuram Tuberculosis Sanatorium, Rajamundry, South India)

১১। সেণ্ট লুকস হাসপাতাল হিল্‌সাইড স্বাস্থ্যনিবাস, ভেনগুরলা।
(St. Lukes Hospital Hillside Sanatorium, Vengurla)

১২। পাহাড়চূড়া স্বাস্থ্যনিবাস, নৈনিতাল, যুক্তপ্রদেশ।
(Hill Crest Sanatorinm, Nainital, U. P.)

এই পুস্তক প্রণয়নে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

Pulmonray Tuberculosis—Fishberg

Pulmonory Tuberculosis—Morriston Davies

Tuberculosis and how to combat it—Pottenger

Hygiene—Rosenau

Hygiene—Kenwood and Kerr

Pamphlets of Tuberculosis Association of Bengal